আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ নবম সংখ্যা
১৬-৩১ জুলাই ২০২০ ১-১৫ শ্রাবণ ১৪২৭

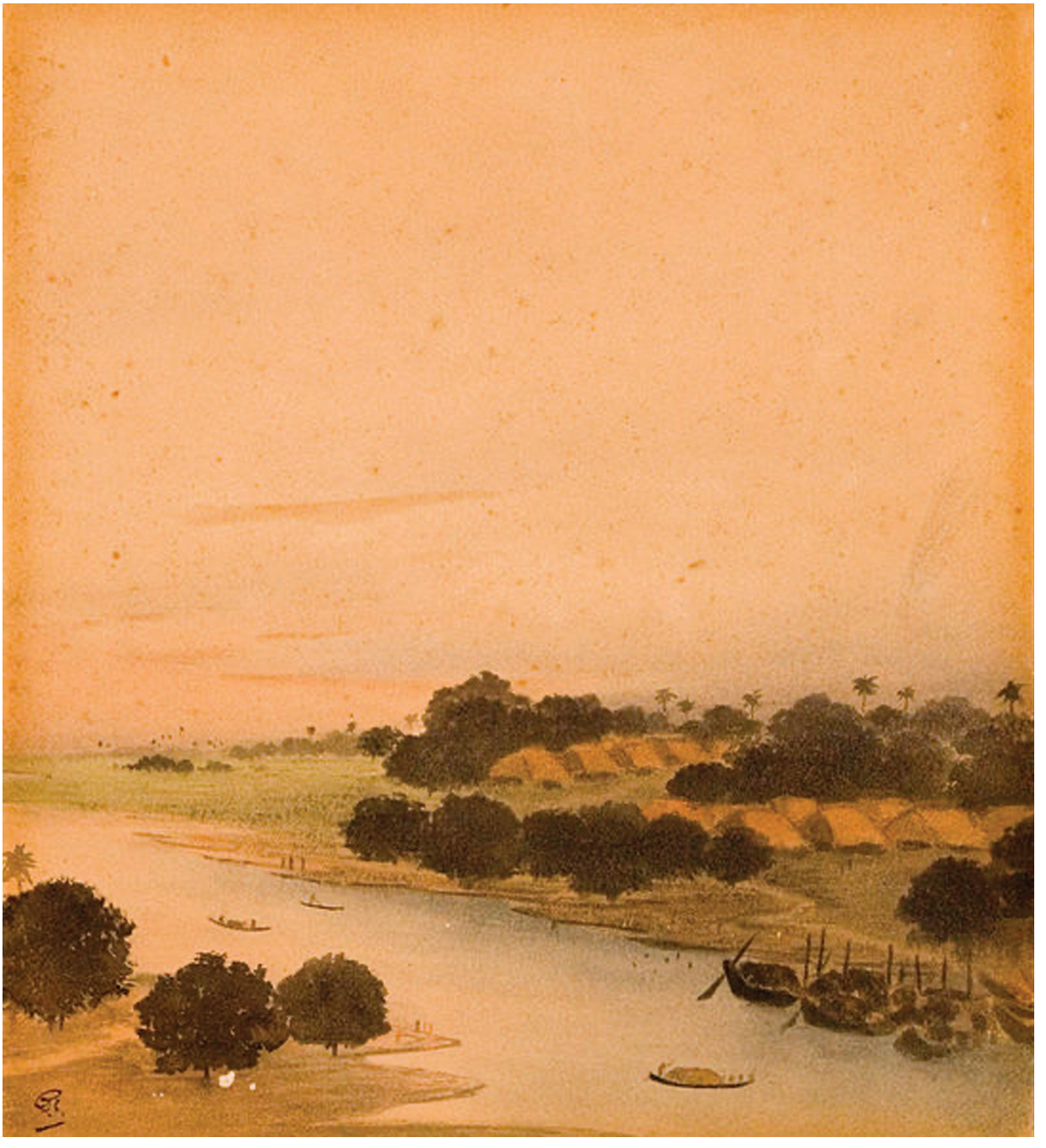

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ নবম সংখ্যা ১৬-৩১ জুলাই ২০২০,
১-১৫ শ্রাবণ ১৪২৭
Vol. 8, Issue 9th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী সংকট ৫
অবরোধের আবহে অবাধ লুট ৮

সমসাময়িক
এই মধ্যযুগই কি তাহলে কাম্য ছিল? ১১
এবার কি পিটিআই ছাঁটাই? ১৩
পরীক্ষার মুখে পরীক্ষাব্যবস্থা ১৫

সংবিধান ও বর্তমান বিচারব্যবস্থা
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৭

অনলাইন পড়াশোনা: একটু তর্ক হোক না
অনুরাধা রায় ২০

কোভিড-পরবর্তী মিডিয়ার পুনর্গঠন জরুরি
সম্বিত পাল ২৫

নতুন প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সম্পর্ক
সাত্যকি রায় ৩০

Covid-19 এবং অথ পরিযায়ী কথা
ব্যাসদেব দাশগুপ্ত ৩৫

রঙিন ছলনা
প্রতিভা সরকার ৩৮

আমাদের দেখে শিখুক আমেরিকা
শংকর কুশারী ৪০

প্লেগের জীবাণুর খোঁজে
মানসপ্রতিম দাস ৪২

মার্কিন দেশে কোভিড অসাম্যের প্রতিচ্ছবি
স্বপন ভট্টাচার্য ৪৬

দেশ হারানো এক কবির গল্প
মননকুমার মণ্ডল ৫০

শেষ নাহি যে
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৫

চিঠির বাক্সো ৫৮

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা
দুই বছর : ৫০০ টাকা
তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন
সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট
নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী সংকট

পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে, স্বাধীনতা উত্তরকালে, এক অভূতপূর্ব সংকটে নিমগ্ন। একদিকে, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ রাজ্যে বেড়েই চলেছে। এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পশ্চিমবঙ্গে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৪৪৮, মৃত্যু হয়েছে ৯৫৬ জনের, সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৯,২১৩ জন। এদিকে রোজই বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা। সংবাদপত্রের পাতায় ফুটে উঠছে মর্মান্তিক ছবি। হাসপাতালের দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে অক্সিজেনের অভাবে মৃত ১৮ বছরের তরতাজা যুবক। করোনা টেস্ট না করালে হাসপাতালে অন্য রোগেরও চিকিৎসা হচ্ছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অম্লান বদনে বলে দিচ্ছেন আগে করোনা পরীক্ষা করে নিয়ে আসুন! কিন্তু কোথায় গেলে পরীক্ষা হবে? কেউ উত্তর জানে না। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের অভিযোগ অনেকদিন ধরেই রয়েছে। এখন করোনার প্রকোপে বেসরকারি হাসপাতালগুলি মানুষের বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে যেমন খুশি মূল্য ধার্য করছে। সরকার যথারীতি দাম কমানোর উপদেশ দিচ্ছে। কিন্তু শুনছে কে? আর না শুনলেই-বা সরকার করছে কী? দুই প্রশ্নের উত্তরই রাজ্যবাসীর অজানা।

সরকার অবশ্য একটা আছে। তারা রোজ ঘটা করে প্রেস কনফারেন্স করছে। আজ অমুক জায়গা লকডাউন, কাল তমুক জায়গা বন্ধ, পরশু বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া যাবে, তরশু বাসে বসে যেতে হবে, ইত্যাদি বিবিধ নিয়মকানুন মানুষের সামনে লাগাতার হাজির করে চলেছে। কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে কি? করোনা নিশ্চিত কতজনের হয়েছে তা সনাক্ত করা নির্ভর করে কতগুলি পরীক্ষা হয়েছে তার উপরে। সমাজে হয়তো ১০০ জন করোনা রোগী আছেন। কিন্তু যদি মাত্র ৫০টি পরীক্ষা করা হয়, তবে কখনোই ১০০ জন করোনা রোগীকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হবে না। তাই পরীক্ষা কতগুলি হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে সঠিক রোগী সনাক্তকরণ। আমাদের রাজ্যে বিগত প্রায় দেড় মাস সময় ধরে ১০,০০০-১১,০০০-এর কোঠায় দৈনিক পরীক্ষার সংখ্যা স্থির হয়ে আছে। কিন্তু রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই মোট পরীক্ষার অনুপাতে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ করোনা আক্রান্তের সঠিক সংখ্যা থেকে আমরা এখনও দূরে। অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে দুটি কাজ সরকারকে করতে হবে। প্রথমত, পরীক্ষার

সংখ্যা অন্তত তিনগুণ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি পরিষেবায় হাসপাতালের শয্যার ব্যবস্থা করতে হবে, অক্সিজেন ও ভেন্টিলেটার-সহ। তদুপরি, বেসরকারি ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলকভাবে কোভিড শয্যার সংখ্যা বাড়াতে হবে দাম নাগালের মধ্যে রেখে। একই সঙ্গে অ-কোভিড রোগীরা যাতে সুচিকিৎসা পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে করোনা একমাত্র সমস্যা যদি হত তাহলে আমরা তাকে স্বাধীনতা উত্তরকালের অভূতপূর্ব সংকট হয়তো বলতাম না। পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে যেই আমফান ঘুর্ণি ঝড় বয়ে গেছে তা দক্ষিণবঙ্গের বৃহদাংশের মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। আমাদের রাজ্যের দুর্ভাগ্য যদি শুধু প্রকৃতির প্রকোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে মানুষ অন্তত নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে সান্ত্বনা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার উপর দাঁড়িয়ে শাসকদলের কর্মীরা যেই ভূতের নাচ নাচছেন তা দেখে মানুষের অন্তরাত্মা শিউড়ে উঠছে, মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়ছেন, অশান্ত হচ্ছেন।

বিগত একমাসের খবরের কাগজ খুলে দেখুন। রোজ খবর বেরোচ্ছে অমুক তৃণমূলের নেতার অক্ষত পাকা বাড়ি, তবু সে বাড়ি ভাঙার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার ঘোষিত ২০,০০০ টাকা পেয়েছে। পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে মানুষের প্রাপ্য টাকা আত্মসাৎ করে নিচ্ছে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা। এই দুরাচার এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে যে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে দুর্নীতি হচ্ছে। তিনি আবার নির্দেশ দিয়েছেন যারা অন্যায়ভাবে টাকা নিয়েছেন তারা যেন টাকা ফেরত দেন। বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত নেতা ও শাসক দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে নেমেছেন, নেতাদের মুচলেকা লিখতে বাধ্য করা হয়েছে, টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়েছে। গ্রাম বাংলায় ঝড়ের পরে দুর্নীতিবাজ নেতাদের দৌরাত্ম সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আর একটু গভীরে গিয়ে আমাদের দুটি প্রশ্ন তুলতে হবে। প্রথম, রাজ্যে আমফান ঝড়ের ক্ষতিপূরণকে কেন্দ্র করে যেই কাণ্ড ঘটে গেল তাকে কি আমরা দুর্নীতি আদৌ বলতে পারি? প্রিয় পাঠক, ভুরু কুঁচকোবেন না। দুর্নীতি বলতে আমরা সচরাচর বুঝে থাকি কোনো একটি কাজ আপনার হচ্ছিল না, আপনি টাকা দিয়ে তা করালেন, বা আপনার ন্যায্য প্রাপ্য পেতে আপনাকে কাউকে ঘুষ দিতে হল, অথবা কোনো বরাত পাওয়ার জন্য ব্যবসায়ী সরকারি আধিকারিক বা মন্ত্রীকে ঘুষ দিল। আমফানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। ধরুন আপনার বাড়ি ভেঙেছে যার জন্য আপনি ২০,০০০ টাকা পাবেন। আমার বাড়ি ভাঙেনি। অথচ আপনি টাকা পেলেন না, কিন্তু আমি পেলাম যেহেতু আমি শাসক দলের সদস্য। এই ক্ষেত্রে আমার ক্ষমতার বলে আপনার টাকা আমি সরাসরি লুট করে ফেললাম। বিনিময়ে আপনি কিছুই পেলেন না। পুঁজির আদিম আহরণের কথা মার্কস বলেছিলেন যেখানে যৌথ সম্পত্তিকে জোর করে ব্যক্তিগত পুঁজিতে রূপান্তরিত করে পুঁজিপতিরা। এখানে অন্যের ধন রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে লুট করে নিচ্ছে শাসকদলের নেতারা। এর থেকে পুঁজি উৎপন্ন হচ্ছে না, যা উৎপাদনে ফিরবে। এর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে সরকারি মদতে এক লুম্পেন শ্রেণি যা যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় থাকতে চায় যাতে অন্যের টাকা লুট অবাধে চলতে থাকে।

কিন্তু কেন? আসলে পশ্চিমবঙ্গে বিগত বহু বছর ধরে কর্মসংস্থান নেই, বিশেষ করে সংগঠিত ক্ষেত্রে। বৃহৎ পুঁজি রাজ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায় সরকার এবং শাসকদলের সঙ্গে জুড়ে সরকারি অনুদান এবং পার্টি সমাজের মধ্যে থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন এক বিশাল সংখ্যক মানুষ। এমন নয় যে সবাই দুর্নীতিগ্রস্থ। কিন্তু শাসক দলের আশির্বাদ ছাড়া, তাদের পাড়াতুতো দাদাদের তুষ্ট না করে ব্যাবসা করা প্রায় অসাধ্য। এমতাবস্থায় যখন সরকারি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বিপুল হয়, তখন এই পরজীবী শ্রেণি তাদের বহুকাল ধরে পালিত ক্ষমতা তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গরিব মানুষের হকের টাকা আত্মসাৎ করতে নেমে পড়ে।

নিন্দুকেরা বলবেন, যত দোষ সবই কি তৃণমূলের? বাম জমানার শেষের দশ বছরে আমরা এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু তা কখনোই এতটা ভয়াবহ চেহারা নেয়নি যেখানে সরকারের শীর্ষ স্তর থেকেই ত্রাণ সংক্রান্ত হরির লুটের কথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এর কারণ আছে। এক গণতান্ত্রিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারী দিনের পরে জন্ম নেয় বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু সেই স্বৈরাচারকে শেষ করেই বামেদের কাজ থেমে থাকেনি। ব্যাপক গণতান্ত্রিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। গ্রামীণ বাংলার জাতি ও শ্রেণি ভিত্তিক স্থিতাবস্থার উপরে আঘাত হানে পঞ্চায়েত রাজ ও ভূমি সংস্কার। নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে

প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন হয়। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে একথা ঠিক। তবু, নিয়মিত নির্বাচন হয়। বামেরা যখন ক্ষমতায় সেই সময় বেশ কিছু আসন ও জেলা পরিষদ বিরোধীদের হাতে চলে যায়। বামেদের আমলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোরজুলুম হয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেয় যেখানে বিরোধীরা প্রার্থী পর্যন্ত দিতে পারে না, শাসক দল বিভিন্ন এলাকায় বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে বাধা দেয়। তাই বর্তমানের পঞ্চায়েতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু প্রতিনিধিরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী, তাই জনগণের কাছে জবাবদিহি করারও কোনো দায় নেই। নাগরিক নয়, গ্রামবাসীরা স্থানীয় শাসক দলের দাদাদের প্রজায় পরিণত। প্রজাদের ভাগের টাকা যদি রাজার পেয়াদারা আত্মসাৎ করে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েতের কাঠামোটাই ধ্বংস, মানুষ ক্ষোভ জানানোর উপায়ও খুঁজে পাচ্ছে না। বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েতে চলছে দামাল ছেলেদের হরির লুট।

তবু প্রতিরোধ হয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু জায়গায় প্রতিবাদ করেছেন। বামেরাও স্তিমিত হলেও প্রতিবাদে আছেন, এছাড়াও বেশ কিছু নতুন প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি মানুষকে সংঘবদ্ধ করছেন। বিজেপি এই পরিস্থিতিতে তাদের গতিবিধি বাড়িয়ে ফেলেছে। অগণতান্ত্রিকতার যেই পথে তৃণমূলের যাত্রা, সেই পথেই রাজ্যের গণতন্ত্রকে খতম করতে বিজেপি শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু গ্রামীণ বাংলায় বামপন্থীদের যেই লড়াই পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিল, তার স্মৃতিও এখন ফিকে হয়ে এসেছে। কংগ্রেসের হাত ধরে গণতান্ত্রিকতার লড়াই লড়া যায়? কংগ্রেসই বামেদের সেই পুরোনো লড়াইয়ের প্রধান শত্রু, আজ তাদের সঙ্গে মিলে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ফিরবে, এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে? অতএব, রাজনৈতিক আঙ্গিকেও পশ্চিমবঙ্গ এক অভূতপূর্ব সংকটের দিকে তাকিয়ে। একমাত্র শ্রেণিভিত্তিক গরিব মানুষের ঐক্য, ঠেকাদার, গ্রামীণ নব্য ধনী শ্রেণি, পরজীবি মাস্তানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র পথ হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সেই পথ নেবে, নাকি সাম্প্রদায়িকতার অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাবে তা নির্ভর করবে গ্রাম বাংলার রাজনীতির গতিপথের উপরে।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

অবরোধের আবহে অবাধ লুট

দেশ অবরুদ্ধ। জনজীবন স্তব্ধ। মুখ ঢেকেছে মুখাবরণ। অজানা অণুজীবের আকস্মিক আক্রমণে সমাজসভ্যতা সঙ্কটাপন্ন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নানারকমের নিয়মনীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। নিত্যনতুন নির্দেশিকা জারি করলেও প্রায় প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে সংক্রমণ। দেশের মানুষ এখন নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। অন্ন চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কারো নজর নেই। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও মুখে মুখাবরণ বা মাস্ক এঁটে রাষ্ট্র কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল। রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিরাষ্ট্রীয়করণ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন সমান গতিতেই হয়ে চলেছে।

এই সর্বনাশী ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন রেল, তেল, টেলিফোন, বিমান, বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কয়লাখনি মহাকাশের উপগ্রহ, এককথায় মাটির গহ্বর থেকে ভূপৃষ্ঠ হয়ে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত যেখানে যা কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ রয়েছে তার বিরাষ্ট্রীয়করণ। সংক্রমণ প্রতিহত করতে বিশ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার ঘোষণা পরিস্থিতিকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে। অনুদান নয়, বিচিত্র মোড়কে সাজানো নানাবিধ ঋণ প্রকল্পের ডালি পরিবেশন করে দায় মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঋণের টাকা জোগাড়ের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রায় সমস্ত উৎপাদন-পরিষেবা-গবেষণা সংস্থাকে নিলামে চড়িয়ে রাজকোষ পূর্ণ করার প্রস্তাব পেশ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নাকি এছাড়া অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদ করেছেন। অর্থ সংগ্রহের বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। রাষ্ট্র নিরুত্তর।

নিলাম প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে নির্দিষ্ট আইন অধ্যাদেশ জারি করে সংশোধন করা হচ্ছে। আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছিল। ২০২০-এর জানুয়ারি মাসে 'কোল মাইনস স্পেশাল প্রভিশনস অ্যাক্ট ২০১৫' এবং 'মাইনস অ্যান্ড মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৫৭'— এই দুই আইনের উপর আরো একবার মানে ষষ্ঠ অধ্যাদেশ জারি করা হল। এই নতুন অধ্যাদেশের নাম দেওয়া হয়েছিল 'দি মিনারেল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০২০'।

সংসদের অধিবেশনে এই অধ্যাদেশও পাস করিয়ে নেওয়ায় 'দি মিনারেল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২০' নামে নতুন আইন তৈরি হয়েছে। এই নতুন আইনের বলে ইতিমধ্যেই ১৫ জুন ৫০টি কয়লা ব্লক নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দেশের প্রধান সেবক নিজে উপস্থিত থেকে নিলামের সূচনা করেন। এখন দেশে দু-ধরনের কয়লা উৎপাদন ব্যবস্থা চলবে। একটি ব্যবস্থা হল 'দি মিনারেল ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২০' এবং 'কোল মাইনস (স্পেশাল প্রভিশনস) অ্যাক্ট ২০১৫' এবং অপরটি 'কোল মাইনস ন্যাশনালাইজেশন ১৯৭৩'। 'কোল মাইনস ন্যাশনালাইজেশন-১৯৭৩' ব্যবস্থায় প্রচলিত পদ্ধতিতে সরকারি নিয়মকানুন অনুযায়ী খনি পরিচালনা অর্থাৎ খনি গহ্বর থেকে কয়লা তোলা, বণ্টন ইত্যাদি চলবে। শ্রমিক কর্মচারীর বেতন, ভবিষ্যনিধি ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলিত পদ্ধতিতেই বজায় থাকবে। নতুন আইন দুটি যেসব খনিতে প্রয়োগ করা হবে সেখানে সরকারি বেতন কাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। সবই নির্ধারণ করবে বেসরকারি মালিক কর্তৃপক্ষ। হয়তো ফিরে আসতে পারে মধ্যযুগীয় কায়দায় শ্রমিক শোষণ যা ১৯৭৩-এ কয়লা শিল্প জাতীয়করণের আগে চালু ছিল। এছাড়াও এই নতুন আইনে প্রত্যেকটি ব্লকের কয়লার গুণমান অনুসারে দাম (পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্লোর ভ্যালু') সরকার ঠিক করে দেবে। সেই দামে বা তার থেকেও বেশি দামে নিলামদার কোম্পানিগুলো কয়লা বিক্রি করে সরকার নির্ধারিত দামের একটি পূর্বনির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দেবে এবং এরা কত পরিমাণ কয়লা বিক্রি করে কত পরিমাপের দাম দেবে তার কোনো হিসেব সরকারের কাছে জমা দেওয়ার দায়বদ্ধতা থাকবে না। এই নতুন আইনের ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের এক নতুন যাঁতাকল তৈরি হল। স্বভাবতই নবাগতদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় কোল ইন্ডিয়া পেরে উঠবে না এবং ধীরে ধীরে রুগ্‌ণ হয়ে লোকসান করতে করতে দেউলিয়া হয়ে এক সময় লাটে উঠে যাবে এতদিনকার এই মহারত্ন প্রতিষ্ঠান। তবে এই দুঃসাহসিক অভিযানে সামান্য হলেও বাধ সেধেছে ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড় এবং মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকার। নিলামের জন্য নির্ধারিত কয়লা ব্লকের তালিকার বেশ কয়েকটি সম্পর্কে এই তিন রাজ্যের আপত্তি আছে।

প্রায় একই সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সংক্রান্ত নতুন আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদুৎ আইনের খসড়ায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বিবাদ-বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জ্বালানির দাম (মূলত কয়লা) কমে বা বেড়ে গেলে বিদ্যুৎ মাশুলও কমে বা বেড়ে যাবে এবং কোন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার কত শতাংশ উৎপাদন করতে পারবে তা স্থির করে দেবে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এখানেই লুকিয়ে আছে আসল ফাঁকি। বিদ্যুতের চাহিদা না বাড়ায় গত কয়েক বছরে সংস্থাপিত বেশ কয়েকটি বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয় উৎপাদন শুরু করতে পারেনি অথবা নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার সামান্য শতাংশ উৎপাদন করেছে। প্রস্তাবিত নতুন আইন প্রয়োগ করতে পারলে নবগঠিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে পূর্ণমাত্রায় কর্মক্ষম করে তোলার সুযোগ দিতে পারে। নিলামে যে প্রতিষ্ঠানগুলি কয়লাখনি কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছে তারাই কিন্তু মূলত বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মালিক। অর্থাৎ নিজের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রর জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজের কয়লাখনির কয়লা ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যাবে। আর সেই কয়লাখনিতে উৎপাদিত কয়লার দাম নিজেই নির্ধারণ করতে পারবে। বিদ্যুৎ মাশুল কয়লার দামের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় গ্রাহককে বেশি দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। সবমিলিয়ে ইচ্ছে মতো কয়লার দাম স্থির করে বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়ে দেওয়ার এ এক সর্বব্যাপী পরিকল্পনা। কয়লাখনির বিরাষ্ট্রীয়করণ ও নতুন বিদ্যুৎ আইনের প্রস্তাব বাস্তবে একে অপরের পরিপূরক।

আইন পালটিয়ে কয়লাখনির বিরাষ্ট্রীয়করণের পাশাপাশি একই সঙ্গে চলছে আইন না মেনে লক্ষ্যপূরণ। যেকোনো নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব করার সময় অন্য অনেক শর্তের সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে একটি নিরীক্ষণপত্র জমা দিতে হয়। প্রস্তাবে পরিষ্কার করে বলতে হয় নতুন শিল্প সংস্থার জন্য উদ্ভূত দূষণ নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিভাষায় একে বলা হয় এনভারনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বা সংক্ষেপে ইআইএ। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পর্ষদের স্থায়ী কমিটি এপ্রিল মাসে এমন কয়েকটি সুপারিশ করেছে যার ক্ষতিকারক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। অসম এবং গোয়ায় এমন চারটি প্রকল্পের জন্য ইআইএ এড়িয়ে গিয়ে স্থায়ী কমিটি সুপারিশ করেছে। স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত প্রস্তাব হিসেবে জাতীয় বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণ পর্ষদের সভায় পেশ করা হয় এবং এই পর্ষদের অধ্যক্ষ হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

অসমের পূর্ব প্রান্তের ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ডেহিং-পাতকাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রায় একশো হেক্টর জমি নর্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের হাতে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে জাতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পর্ষদের স্থায়ী কমিটি। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহযোগী নর্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস অসম রাজ্যে কাজ করে। মার্ঘেরিটা ব্রাউন কোল খনিও নর্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে নর্থ ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের ঐতিহ্যবাহী মার্ঘেরিটা বা জন্ম নিতে চলা ডেহিং-পাতকাই কয়লাখনি কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলা কঠিন। অসমের বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই ঝাড়খণ্ড এবং ছত্রিশগড় রাজ্য সরকারের মতো কয়লাখনির বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরোধীতা করবে না।

ডেহিং-পাতকাই বন্যপ্রারী সংরক্ষণের প্রায় একশো হেক্টর জমিতে খোলামুখ (ওপেন কাস্ট) কয়লাখনি তৈরি করে নিয়মিত কয়লা তোলার বন্দোবস্ত করা হবে। কয়লাখনি চালু হলে এই একশো হেক্টরের গাছপালা আর থাকবে না। এখানকার পশু-পাখি অন্যত্র চলে যাবে। পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাবে হারিয়ে যেতে পারে বেশ কিছু বিরল প্রজাতির পশু-পাখি এবং মাছ। কয়লাখনির কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে এই এলাকায় তৈরি হবে ভারী ট্রাক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম বহনোপযোগী মজবুত পাকা সড়ক। গড়ে উঠবে দপ্তর আবাসন। বাড়বে জনসংখ্যা। যানবাহন চলাচল বেড়ে যাবে। সবমিলিয়ে কয়লাখনির জন্য নির্ধারিত প্রায় একশো হেক্টর জমির চরিত্র বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালটিয়ে যাবে পারিপার্শ্বিক এলাকার পরিবেশ। স্থানীয় জনজাতির নিজস্ব কৃষ্টি, জীবনযাপন প্রক্রিয়া লুপ্ত হয়ে যাবে। সর্বোপরি ২০০৪ সালে ২২ জুলাই সংসদের অনুমোদন নিয়ে জনজাতির জন্য অরণ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল (ট্রাইবাল ফরেস্ট প্রটেকশন অ্যাক্ট ২০০৪) তাকে সরাসরি লঙ্ঘন করা হবে। দূষণের দাপটে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ডেহিং-পাতকাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের চিরায়ত চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

জাতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পর্ষদের স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুসারে গোয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। গোয়ার পরিবেশবিদরা রাজ্য স্তরে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে কর্ণাটকের হসপেট থেকে গোয়ার ভাস্কো বন্দর পর্যন্ত নতুন রেললাইন বসানো হবে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান রেললাইনের সমান্তরালভাবে ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নতুন লাইন বসানোর ফলে পশ্চিম ঘাটের ১২৮.২৮ হেক্টর এলাকা বিপন্ন হয়ে যাবে। ইউনেস্কোর হেরিটেজ এলাকা হিসেবে স্বীকৃত পশ্চিম ঘাটের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভগবান মহাবীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। গোয়ার পানাজি থেকে উত্তর কর্ণাটকের বেলাগাভি পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ১২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি অংশের প্রস্থ বাড়ানোর ফলে মহাবীর বন্যপ্রাণী ও মোল্লেম জাতীয় উদ্যানের ৩২ হেক্টর বনাঞ্চল হারিয়ে যাবে। তৃতীয় প্রস্তাবে একটি ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যবস্থা বা ট্রান্সমিশন লাইন সংস্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য বেশি জমি দরকার হয় না। কিন্তু গোয়ার সঙ্গদ থেকে কর্ণাটকের সীমান্ত পর্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য কাটা পড়বে চার হাজারেরও বেশি প্রাচীন গাছ। বিভিন্ন বিরল প্রজাতির পাখির এইসব গাছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাস। তারাও চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে।

অবরোধের অন্তরালে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ডেহিং-পাতকাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মৃত্যুঘন্টা নির্বিঘ্নে এবং নির্দ্বিধায় বাজিয়ে দেওয়া হল। একই সঙ্গে গোয়ার ঐতিহ্যবাহী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জাতীয় অভয়ারণ্যের সর্বনাশ করে বিকাশের জয়ধ্বনির বন্দোবস্ত হয়েছে। ৭ এপ্রিল স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অরণ্য ও বণ্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বমোট ১৬টি প্রস্তাব পেশ হয়। বলাই বাহুল্য, সবকটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়। ১৫ এপ্রিল অরণ্য ও পরিবেশ মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ কমিটি স্থায়ী কমিটির সব সিদ্ধান্তেই শিলমোহর দেয়। একাধিক কেন্দ্রীয় আইন লঙ্ঘন বা অবজ্ঞা করে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে ঘটে চলেছে একের পর এক অপরাধ। শিল্পস্থাপন, খনিজ উত্তোলন, উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ সরকারের দায়িত্ব। প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু অভয়ারণ্য ধ্বংস করার মূল্যে, মানুষের প্রাণের মূল্যে তা কেন করা হবে? নিরাপত্তা ও প্রকৃতি সংরক্ষণের বিধি মেনে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার অজস্র দৃষ্টান্ত তো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। নিয়মিত বিশ্ব পরিক্রমার সময় সেইসব প্রকল্প বোধহয় নজরে আসে না। বাস্তবসম্মতভাবে দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বদলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিরাষ্ট্রীয়করণ করাই যখন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যায় তখন সামগ্রিকভাবে দেশকেই খেসারত দিতে হয় এবং জাতীয় অবরোধের আড়ালেও সেই প্রক্রিয়া সমানভাবে সক্রিয়। ভবিষ্যতে যদি কখনো এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ময়নাতদন্ত হয় এবং সুপারিশকে বিধিসম্মত হয়নি বলে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে কি ফিরিয়ে আনা যাবে যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির নিজের খেয়ালে গড়ে ওঠা অসম ও গোয়ার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ?

সমসাময়িক

এই মধ্যযুগই কি তাহলে কাম্য ছিল?

প্রখ্যাত দার্শনিক ফ্রেডেরিক নিৎশে একবার বলেছিলেন, 'রাক্ষসের সঙ্গে কেউ যদি লড়তে যায়, তার এটা আগে দেখা উচিত সে নিজে রাক্ষস হয়ে যাচ্ছে কী না'। বর্তমান রাষ্ট্রকে দেখে আপাতত মনে হচ্ছে, সমাজবিরোধী, মাস্তান এবং মাফিয়ারাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তা নিজে একটা বড়ো মাফিয়াতে পরিণত হয়েছে। মুখে বলা হচ্ছে বটে যে অন্ধকার জগতের টেকনিক প্রয়োগ না করলে সেই জগতকে ধ্বংস করা যাবে না— কিন্তু এসবই আসলে অজুহাত। একটা নৃশংস অমানবিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে তার উপাদানগুলি, যেমন পুলিশ, প্রশাসন, আদালত, এদের সবাইকে প্রয়োজনমতো ডিহিউম্যানাইজেশন বা অমানবিকীকরণের প্রক্রিয়াটাও জরুরি। আর এরই সূত্র ধরে বার বার ঘটে চলেছে বিচারবহির্ভূত হত্যা।

উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত বাহুবলী বিকাশ দুবের এনকাউন্টার আবার সেই পুরোনো তর্কটাকে সামনে এনে দিচ্ছে— রাষ্ট্র কতদূর যেতে পারে? অপরাধ দমনে কি সংবিধানকেও অগ্রাহ্য করতে পারে রাষ্ট্র? যদিও এক্ষেত্রে তাগিদটা কতখানি অপরাধ দমনের ছিল সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। মনে রাখতে হবে, নব্বই দশকের মধ্যভাগ থেকে বিকাশ দুবের যা উত্থান, তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থেকেছে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি এবং জাতপাতের সমীকরণের অঙ্কটিও। প্রথমে বিজেপি-র ছত্রছায়ায় বিকাশের বাড়বাড়ন্ত, কারণ সে ছিল ব্রাহ্মণ। একজন ব্রাহ্মণ ডনকে তুলে ধরবার মধ্য দিয়ে বিভাজনের রাজনীতি এবং ব্রাহ্মণ্য দাবি-দাওয়ার অঙ্কটি সুচতুরভাবে চেলেছিল বিজেপি। পরে বিকাশ দল বদলে যায় বিএসপি-তে। তারপর কখনো বিএসপি, কখনো সমাজবাদী পার্টির হাতে তামাক খেয়ে সে আবার ফিরতে চেষ্টা করছিল পুরোনো দলে। রাজনীতির সঙ্গে অপরাধ জগতের যোগের বহুচর্বিত তত্ত্বটি বাদ দিয়েও সাদা বাংলায় বলা যায়, বিকাশকে বাঁচিয়ে রাখলে হয়তো অনেক গোপন তথ্যই সামনে এসে যেতে পারত। তাই তার এনকাউন্টার রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু সেটা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, যদি প্রশাসনের সদিচ্ছার কথা মেনে নিই, তার পরেও প্রশ্ন জাগে, এই এনকাউন্টার কতটা যুক্তিযুক্ত, অথবা ন্যায্য।

মোটামুটি ধরে নেওয়াই যায় যে বিকাশ দুবেকে নিরস্ত্র অবস্থায় মেরে ফেলা হয়েছে। পুলিশ যদিও একটা খুব দুর্বল গল্প খাড়া করেছে নিজেদের সপক্ষে। স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের বয়ান মোটামুটি এই: যে-গাড়িতে বিকাশ ছিল, কানপুর জেলার ভানুটি এলাকায় সেটির সামনে আচমকা এসে যায় গোরুর পাল। দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত চালক বৃষ্টিভেজা হাইওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারান। গাড়ি উলটে যায়। পাঁচজন পুলিশ গুরুতর জখম হন। এই সময়ে রমাকান্ত পচৌরি নামে এক ইনস্পেক্টরের নাইন-এমএম পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে কাঁচা রাস্তা ধরে পালায় বিকাশ। অন্য গাড়ির পুলিশকর্মীরা বিকাশকে ধরে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঘিরে ফেলতেই সে নাগাড়ে গুলি চালাতে থাকে। পুলিশকর্মীদের খুন করতেই চেয়েছিল সে। তাই আত্মরক্ষায় পালটা গুলি চালানো ছাড়া পুলিশের উপায় ছিল না।

কিন্তু এই বয়ান যে কতখানি ফাঁপা, সেটা মোটামুটি সমস্ত সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলালেই বোঝা যাবে। গাড়ি শোয়ানো রয়েছে। চারটি দরজা বন্ধ। শুধু একটি জানলার কাঁচ ভেঙেছে। এত মোলায়েমভাবে গাড়ি উলটে যায় না। পুলিশ বলছে, চার পুলিশকর্মী গাড়ি উলটে আহত। বিকাশ কীভাবে অক্ষত অবস্থায় ২০০ মিটার দৌড়ালো? শুধু তাই নয়, কানপুর টোল প্লাজার পরে আটকে দেওয়া হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের গাড়িকে। পুলিশের যে গাড়িতে বিকাশ ছিল, সেটি চলে গিয়েছিল সাংবাদিকদের নজরের বাইরে। কেন সংবাদমাধ্যমকে ব্লক করা হল সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। আর সবথেকে হাস্যকর তো গাড়ি খারাপ হবার যুক্তি। গত কয়েক দিন বিকাশের পাঁচজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে এনকাউন্টারে। প্রথমে তার মামা প্রেমপ্রকাশ দুবে। তারপরে অতুল দুবে, প্রভাত মিশ্র এবং প্রবীণ ওরফে বৌবা দুবে। প্রভাত নিহত হওয়ার পরে পুলিশ বলেছিল, তাকে গ্রেফতার করে আনার পথে গাড়ির

চাকা পাংচার হয়। চাকা সারানোর সময়েই পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে প্রভাত পালাতে যায় এবং মারা পড়ে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের গাড়ির অবস্থা আচমকাই এত খারাপ হয়ে গেল কী করে যে সবকটা এনকাউন্টারের আগেই গাড়ির গণ্ডগোল হচ্ছে? এরকম আরো বহু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, এবং এটা ধরে নেওয়াই যায় যে এনকাউন্টারের নামে ঠান্ডা মাথার খুন হয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে বিকাশ কুখ্যাত অপরাধী যার নামে ৬১টা মামলা ঝুলছে। কিন্তু বার বার যেটা বলার, রাষ্ট্র আর বিকাশ এক সারিতে বসতে পারে না। বিকাশ আইন বহির্ভূতভাবে মানুষ মারে বলে রাষ্ট্রও যদি একই কাজ করে তাহলে রাষ্ট্র আর বিকাশের কোনো পার্থক্য থাকে না। বিকাশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নিৎশের কথা অনুসারেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠে আরেক বিকাশ। আমরা যে সত্য বার বার ভুলে যাই— রাষ্ট্র কখনো প্রতিহিংসার বশে চালিত হতে পারে না। ওসব হিন্দি সিনেমায় মানাতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র মানে এক ন্যায়, সমানাধিকার এবং সুনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা অস্তিত্ব। সেখানে জাতির পিতা যে বিচারের প্রত্যাশা করেন, কুখ্যাততম অপরাধীও সেই একই বিচারের অংশভাক হবার দাবি রাখে। সে জঘন্য বলে রাষ্ট্রব্যবস্থাও যদি জঘন্য হয়ে যায়, তাহলে তা পরিণত হয় ক্ষমতার হাতে ভাড়াটে সৈন্যতে। বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবার আগেই যদি অপরাধীকে মেরে ফেলা হয়— মনে রাখতে হবে, কিছুদিন আগেই অন্ধ্রপ্রদেশে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত চারজনকে একইভাবে মেরে ফেলেছিল পুলিশ— তাহলে আইন আদালত সংবিধান এসব রাখার দরকার কী? মব জাস্টিস এবং খাপ পঞ্চায়েতকেই মডেল করে এগোনো হোক। এই মধ্যযুগই কি তাহলে আমাদের কাম্য ছিল?

জানি, অনেকেই এই প্রশ্ন তুলবেন যে বিকাশ দুবে যে পুলিশ অফিসারদের মেরেছে অথবা অসংখ্য নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের প্রতি কি এটা সুবিচার নয়? তাদের কথা কি ভাবতে হবে না? স্পষ্ট উত্তর হল, না ভাবতে হবে না। আমরা সাধারণ মানুষ তাঁদের অপরিমেয় ক্ষতি ভেবে শিহরিত হতে পারি, কিন্তু রাষ্ট্র পারে না। তাহলে তা হয়ে যায় পক্ষপাতদুষ্ট। রাষ্ট্র যদি আজ নিহত পুলিশের পরিবারের সেন্টিমেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে এই এনকাউন্টার ঘটায়, তাহলে সমতা রক্ষার জন্য বিকাশের পরিবারের ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিয়ে এনকাউন্টার করা পুলিশকর্মীদের এনকাউন্টার করবার কাজটাও রাষ্ট্রকেই করতে হবে। আর তারপর, আবারও নিহতের পরিবারের ভাবাবেগের সম্মানে আরেক প্রস্থ এনকাউন্টার। এর কোনো শেষ নেই। রাষ্ট্র প্রতিশোধের খেলায় নামতে পারে না, যেটা আমি আপনি সাধারণ মানুষ পারি। তাহলে ন্যায়ের ভিত্তিটাই আর থাকে না, থাকে শুধু জঙ্গলরাজ। বিকাশ দুবে জঘন্য অপরাধী ছিল। সে কিছু একটা সাজা পেয়েছে। কিন্তু এই যে ক্রমবর্ধমান হারে বিচারবহির্ভূত পুলিশি হত্যা, এগুলোর সাজা কে, কবে পাবে?

তাহলে করণীয় কী? হত্যাকারীরা হত্যা করবে, আর রাষ্ট্র শাস্তি দেবে না? শুধুই মানবাধিকার? না। রাষ্ট্র শাস্তি দেবে। কিন্তু তা বিধিসম্মতভাবে দিতে হবে। অপরাধীর খোলা আদালতে বিচার করতে হবে। জনসমক্ষে, বিচারকের সামনে বিধিসম্মতভাবে প্রমাণিত করতে হবে যে হ্যাঁ অমুক ব্যক্তি অপরাধী, তবেই রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে। তা না হলে দেশে গণতন্ত্র বাঁচে না। আজ বিকাশ দুবে, কাল হয়তো নিরীহ মানুষকেই অপরাধী দাগিয়ে দিয়ে গুলি করে মারবে পুলিশ। তাই বিকাশ দুবের পক্ষে নয়, ন্যায়ের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে এনকাউন্টারের বিরোধীতা করা জরুরি।

এবার কি পিটিআই ছাঁটাই?

'...সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।...'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাহিনী
(কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩০৬)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে রচিত 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় যা উচ্চারিত হয়েছিল, একটা শতাব্দী পেরিয়ে আসার পর এই একবিংশ শতাব্দীতেও তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। প্রযুক্তির কল্যাণে প্রতি মুহূর্তের খবর এখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে হাতের মুঠোয় পৌঁছে যাচ্ছে। তবুও প্রতিনিয়ত জারি হচ্ছে সংবাদ বিষয়ক সতর্কতা। সংবাদ সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণে কোনো সীমারেখা নেই। প্যারিস-ভিত্তিক সংগঠন 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ)' ১৮০টি দেশের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে যে তালিকা প্রতি বছর প্রকাশ করে, তাতে এই বছরের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ভারত রয়েছে ১৪২ নম্বরে! এরপরও সংবাদের সচ্ছন্দ সম্প্রচারে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ হয়ে চলেছে। জুনের শেষ সপ্তাহে জাতীয়তাবিরোধী তকমা পেল সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই)। লাদাখ সংক্রান্ত কিছু খবর ও সাক্ষাৎকার প্রকাশের জেরে পিটিআইকে বার্ষিক চাঁদা বা সাবস্ক্রিপশন বন্ধের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রসার ভারতী। জানানো হয়েছে যে এমন জাতীয়তা বিরোধী খবরের পরে পিটিআই-এর সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখা যায় না। ওই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে পিটিআই জানিয়েছে যে যথাসময়ে প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। পিটিআই-এ প্রায় সাত কোটি টাকার বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন দেয় প্রসার ভারতী। তা ছাঁটার হুমকি দিয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, '২০১৬-১৭-র পর থেকে এর রিভিউ হয়নি। এইবার শীঘ্রই প্রসার ভারতী তার সিদ্ধান্ত জানাবে।'

লাদাখে ভারতীয় জমি চিন দখল করেছে কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিদেশ মন্ত্রক পরে তা ঘুরিয়ে মেনে নিলেও প্রধানমন্ত্রী দাবি করলেন,— 'কেউ কোথাও প্রবেশ করেনি।' কিন্তু বেজিংয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধৃত করে পিটিআই-এর খবরে ইঙ্গিত ছিল 'চিনা অনুপ্রবেশের'। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের আশা, শীঘ্রই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে পিছু হটবে বেজিং।' যার অর্থ, চিন ঢুকেছিল ভারতীয় ভূখণ্ডে।

এই সাক্ষাৎকার প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা পরেও বেজিং থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কিংবা বিদেশ মন্ত্রক কোনো আপত্তির কথা জানায়নি। প্রায় একই সময়ে পিটিআই-কে দেওয়া অন্য এক সাক্ষাৎকারে দিল্লিতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত দাবি করেন, ১৫ জুনের সংঘর্ষের দায় চিনের নয়। বরং তা ভারতের। ভারতের পদক্ষেপ 'দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রসার ভারতীর নাকি এই খবর এবং সাক্ষাৎকার দুটি পছন্দ হয়নি। সরাসরি বিবৃতি না দিলেও তাদের গায়ে 'জাতীয়তাবিরোধী' তকমা লাগার পিছনে যে এই দুটি সাক্ষাৎকার, তা প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে পিটিআই। তবে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, খবরের উপর খবরদারি করাটা কি প্রসার ভারতীর কাজ? কোনো খবর বা সাক্ষাৎকার 'জাতীয়তাবিরোধী' কি না, প্রয়োজনে তা দেখার জন্য প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক রয়েছে।

পিটিআই এই মুহূর্তে দেশের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থা। মূলত অলাভজনক সমবায়। ৫০০-রও বেশি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রধান সংবাদ সূত্র। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এবং বিদেশের খবর পিটিআই পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে বিক্রি করে। দূরদর্শন ও আকাশবাণীও সেই অর্থে সংবাদ ক্রেতা। প্রসার ভারতী পিটিআই-কে দূরদর্শন ও আকাশবাণীকে সারাদিন খবর জোগানের জন্য দাম দেয় যা পিটিআই-এর মোট আয়ের মাত্র ৬ শতাংশ।

পিটিআই বিভিন্ন বেসরকারি সংবাদমাধ্যম সংস্থার সমবায়ে তৈরি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। পিটিআই-এর পরিচালন সমিতিতে কোনো জনপ্রতিনিধি নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি। তবে পিটিআই-এর পরিচালন সমিতিতে প্রাক্তন বিদেশ সচিব, প্রাক্তন বিচারপতি, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য-সহ চার জন নিরপেক্ষ ডিরেক্টর রয়েছেন। পিটিআই-এর একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৯০৫-এ কে সি রায় তৈরি করেছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া বা এপিআই। ১৯১৯ সালে তা রয়টার্স অধিগ্রহণ করে। তবে এপিআই নাম রেখে দেয়। ১৯৪৭ সালের ২৭ অগাস্ট পিটিআই তৈরি হয়। দুই বছর পরে তারা এপিআই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে রয়টার্সের সঙ্গে তখনও যোগ ছিল। সেটা ১৯৫৩-য় ছিন্ন হয়।

ইতিহাস বলছে, ১৯৭৬-এ জরুরি অবস্থার সময়ে এমনই চিঠি পেয়েছিল পিটিআই। পাঠিয়েছিল আকাশবাণী। সেবারও বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন বন্ধের হুমকি দিয়ে পিটিআই-সহ দেশের চারটি অলাভজনক সংবাদ সংস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। পিটিআই, ইউএনআই, হিন্দুস্তান সমাচার, সমাচার ভারতী মিলে তৈরি হয় সমাচার। জরুরি অবস্থার পরে ১৯৭৮-এর এপ্রিলে আবার চারটি সংবাদসংস্থা আলাদা হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে বিবিসি-র ধাঁচে একটি স্বশাসিত সংবাদ

সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি সংসদে পেশ করেছিলেন তখনকার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এল কে আদবানি।

প্রায় দুই দশকের টানাপোড়েনের পর অবশেষে ১৯৯৭-এ স্থাপিত হয় প্রসার ভারতী। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল যিনি একসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ছিলেন। আই কে গুজরালের সহযোগিতায় তখনকার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এস জয়পাল রেড্ডির প্রত্যক্ষ উদ্যোগে প্রসার ভারতী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল।

স্বশাসিত বলে ঘোষণা করে যাত্রা শুরু করলেও সূচনা পর্ব থেকেই প্রসার ভারতী স্বাবলম্বী নয়। আজও কি হয়েছে? তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের ডেপুটেশনে পাঠিয়ে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর কাজ চালানো হয়। সবমিলিয়ে প্রসার ভারতী সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সম্প্রচার সংস্থা। আদর্শ হিসেবে বিবিসি-কে সামনে রাখার কথা বলা হলেও প্রসার ভারতী কি কোনোদিন শিরদাঁড়া টানটান করে চলতে পেরেছে? ১৯৮২-র এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত আর্জেন্টিনার সঙ্গে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ব্রিটেনের যুদ্ধ চলছিল। তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'আয়রন লেডি' বলে পরিচিত মার্গারেট থ্যাচার বিবিসি-র সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন। বিবিসি-র চেয়ারম্যানকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে দেশের শত্রুর কথা সম্প্রচার করে বিবিসি দেশবিরোধী কাজ করছে। উত্তর দিতে গিয়ে বিবিসি-র চেয়ারম্যান লিখেছিলেন যে একজন মৃত সৈনিকের মরদেহ লন্ডনের বাড়িতে পৌঁছোনোর পর তাঁর মায়ের চোখ যেমন অশ্রুসিক্ত হয় ঠিক একইভাবে আর্জেন্টিনার কোনো মা কাঁদতে থাকেন যখন তাঁর সৈনিক পুত্রের মরদেহ বুয়েনস আইয়ার্স-এ পৌঁছোয়। বিতর্ক আর এগোয়নি।

তবে জার্মানির ব্যাপারটা অত সহজ সরল ছিল না। ১৯২৩-এ অ্যাডলফ হিটলার নামের জনৈক ব্যর্থ চিত্রশিল্পী এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈনিক জার্মানির বিভিন্ন শহরে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাষণ দিতে শুরু করেন তখন থেকেই 'মিউনিখ পোস্ট' পত্রিকা হিটলারের সমালোচক। ১৯২৩-এর ৮ নভেম্বর হঠাৎ করে মিউনিখ পোস্ট-এর দপ্তর আগুন লেগে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়। তবে সংবাদপত্রটি হাল ছাড়েনি। ধারাবাহিকভাবে হিটলারের সমালোচনা চলতেই থাকে। হিটলারের ভাষণ এবং তার দলের কীর্তিকলাপের মধ্যে স্বৈরাচারী প্রবণতা প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরে মিউনিখ পোস্ট। ১৯৩৩-এ হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মিউনিখ পোস্টের সম্পাদক ও কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়। জনাকয়েক সাংবাদিক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এবং মিউনিখ পোস্ট বন্ধ হয়ে যায়।

প্রসার ভারতী কোনোদিন বিবিসি-র ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ভবিষ্যতে পারবে এমনটাও কেউ আশা করে না। তবে অনেকেরই আশঙ্কা এই অজুহাতে পিটিআই এবং ইউএনআই বা ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া-র মতো সংবাদসংস্থার বদলে প্রসার ভারতী 'সমাচার ভারতী'-র সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। সমাচার ভারতী-র পরিচয় নতুন করে দেওয়ার দরকার নেই। পিটিআই-কে ছাঁটাই করে সমাচার ভারতী-র দাওয়াই প্রয়োগ করলে তথ্য ও সংবাদ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী প্রবণতা আরো দ্রুত প্রকট হয়ে যাবে।

পরীক্ষার মুখে পরীক্ষাব্যবস্থা

আমাদের শিক্ষা শ্রেণি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। পুণ্য পবিত্র ইত্যাদি সব বয়ান ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন। শিক্ষালয় না কি মন্দির? আচ্ছা, মন্দিরের মতো বৈষম্য দেখেছেন? জাতি বৈষম্য ধর্ম বৈষম্য ছাড়াও আছে অর্থ বৈষম্য। যত টাকা প্রণামী তত বেশি তাড়াতাড়ি ঠাকুর দর্শন।

বিকাশ দুবে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে ধরা দিয়ে অথবা ধরা পড়ে প্রমাণ করলেন, মহাকাল কাউকে বাঁচাতে পরেন না। বিকাশ দুবেকে ধরার কারিগর রুবি যাদব নামে তরুণী। যিনি ছিলেন মন্দিরে নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্বে। তাঁর চাকরি গেছে! কারণ অনুমেয়।

মহাকাল কাউকে রক্ষা করতে পারেন না— এই বার্তা প্রচার হলে ধর্ম ব্যাবসা মার খাবে। এই উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে প্রতিদিন এক মণ করে গাওয়া ঘি দেওয়া হয়। সরকার থেকে। এটি মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান অনুযায়ী। উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দিরের সম্পত্তি বর্ধনে মোঘল অবদান প্রচুর। সেসব ইতিহাস বইয়ে লেখা হয় না।

পাড়ার লোকের করোনা ধরা পড়ে, পড়লে লোকে গাল দেয়। আর অমিতাভ বচ্চন হলে সংবাদপত্র লেখে, করোনা হয়েছে। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে। সুন্দরবনে মিড-ডে মিল দেওয়ায় নাকি প্লাস্টিক প্যাকেট বেড়ে গেছে। মহা আনন্দে লিখছে, সংবাদপত্র। সন্দেহ নেই এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অন্যবিষয়গুলিও ভাবা দরকার। এই সংবাদ একপেশে। শ্রেণিঘৃণার প্রকাশ। ভাবুন। বাংলা মাধ্যমের ছাত্র না বাঁচলে বাংলা কাগজ পড়ার লোক থাকবে না। মিড-ডে মিল বিরোধীদের ছেলে-মেয়ে ইঞ্জিরি স্কুলে যায়, বাংলা কাগজ তেমন পড়ে না। নিজের বাড়ির লোক চাকরি করে বলে বাধ্য হয়ে পড়ে।

ত্রাণের নামেও কম প্লাস্টিক ছড়াননি অনেকে! বিভিন্ন পত্রিকার শারদ সংখ্যাগুলি কিসে মোড়া থাকে? শ্যাম্পু, সাবান, স্যানিটারি, ন্যাপকিন, তেল, নুন, বিস্কুট, চিপস, কুড়কুড়ে, চকলেট সবেতেই যে এখন প্লাস্টিক প্যাকেট। সে নিয়ে লিখবেন না? শুধু মিড-ডে মিল নিয়ে খবর? একদল শিক্ষক চান তাঁরা ঘরে বসে বেতন পাবেন এবং শিক্ষার্থী— যাঁদের জন্য বেতন পান— তাঁরা না খেয়ে থাকবেন। এঁদের ছেলে-মেয়েদের এঁরা অধিকাংশই বাংলা মাধ্যমে শুধু নয় রাজ্য বোর্ডেও পড়ান না। নিজেদের প্রতি আস্থা নেই। এরা বাঙালি ও হীনমন্যতায় ভোগেন।

মধ্যবিত্তীয় ভণ্ডামি। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কিন্তু ব্যাগ আনতে বলা হয়েছে। তাতেই খাওয়ার দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু সব দোষ মিড-ডে মিলের। গরিবদের ছেলে-মেয়ে মিড-ডে মিল খান। অনেকেই চান এটি উঠে যাক। উঠে গেলে বহু শিশু-কিশোর শ্রমিক হবেন। পাচার হয়ে যাবেন অনেক কিশোরী। পেটের দায়ে।

করোনা কাল দেখিয়ে দিয়েছে সমাজে আর্থিক বৈষম্য কত তীব্র। ৭০ শতাংশ ছেলে-মেয়ে অনলাইনে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দেশে মাত্র ৬২ শতাংশ মানুষ আন্তর্জাল ব্যবহার করতে পারেন। তাও একজনের হাতে একাধিক মোবাইল নাম্বার ও নেট সংযোগ। সংখ্যাটা আসলে আরো কম হবে।

কেরলের এক ছাত্রী মোবাইল ফোন না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। গত ৯ জুলাই একই ঘটনা ঘটেছে ত্রিপুরায়। অর্পিতা নমো। বয়স ১৪। নবম শ্রেণি। সোনামুড়ার ঠাকুরমুড়ার বাসিন্দা। বাবা ফুলু নমো পেশায় রাজমিস্ত্রি, নির্মাণশ্রমিক। কাজ নেই। করোনাকালে। পেট চলে না। মোবাইল কিনে দেবেন কী করে?

পশ্চিমবঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থী শুভজিৎ মারা গেলেন চিকিৎসার জন্য দোরে দোরে ঘুরে। ছোটোবেলা থেকে ডায়াবেটিস। বাড়িতে পরীক্ষার যন্ত্র নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতাল ইএসআই-এ গেলেন। প্রত্যাখ্যাত। ছুটলেন নার্সিংহোমে। করোনা সন্দেহে নিল না। শেষে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ছেলেকে ভরতি করাতে পারলেন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে।

শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গী উধাও আজকাল। অমিতাভ বচ্চন সেলিব্রিটি। ভরতি হয়েছেন নেহরু প্রতিষ্ঠিত নানাবতী হাসপাতালে। এবং সে নিয়েও কথা উঠছে। এটি প্রচার ও বিজ্ঞাপনের অঙ্গ কি না? কারণ অমিতাভ বচ্চনের একাধিক বাংলো আছে। এখন যেখানে আছেন, সেখানে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার ও আইসিইউ আছে। তিনি এবং অভিষেক বচ্চন উপসর্গহীন। এক্ষেত্রে বাড়িতে না থেকে নানাবতী হাসপাতালে ভরতি হয়ে এত প্রশংসা করতে শুরু করলেন কেন? ইদানিং নানাবতী হাসপাতাল খারাপ চিকিৎসা ও ভুয়ো এবং বিপুল বিলের কারণে সংবাদ শিরোনামে আসছিল। নানাবতী হাসপাতালের মালিক এখন রেডিয়ান্ট। সেখানে বচ্চনদের টাকা খাটে। সংবাদ মূলত কাব্য নয়, সেখানে কত পরীক্ষা করে পড়তে হয় ভেতরে কী রহস্য আছে।

এদিকে দেশের প্রায় তিন কোটির বেশি ছাত্র-ছাত্রী অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটালেন। মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল রাজ্য ও দিল্লি বোর্ডের। বাকি ছিল উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা। রাজ্যে এবার ৮,২৬,০২৯ জন পরীক্ষার্থী। এঁদের মধ্যে ছাত্রী বেশি। ৪,৭০,৫৪৮ জন। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১৩ লাখ। সারা ভারতে মাতৃভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক

দেয়-আড়াই কোটির বেশি ছাত্র-ছাত্রী। সিবিএসই বোর্ডে সারা ভারতে গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে ৩১,১৪,৮২১ জন। এখানে ছাত্রী কম। ১২.৯ লাখ। বালক ১৮ লাখের বেশি। এটা সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের ইঙ্গিতবাহী। অনেকেই ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ান মেয়েকে মাতৃভাষা মাধ্যমে। সিবিএসই বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্বোচ্চ তিনটি পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটির গড় নম্বর দেবে ছাত্রকে বাকি থাকা পরীক্ষায়।

দেশের ১৮টি রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। আসাম, বিহার, ছত্রিশগড়, গোয়া, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, দাদরা নগর হাভেলি, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কর্ণাটক। পশ্চিমবঙ্গ বাকি থাকা রাজ্যের একটি। একাধিকবার দিন বদলেও করোনার প্রাবল্যের জন্য পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। এখানেও সিবিএসই বোর্ডের নিয়ম কার্যকর হবে।

সমস্যা দেখা দিয়েছে, চারটি জায়গায়। এক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে। সমস্যা এক, স্নাতক স্তরের প্রথম ষণ্মাসে (সেমিস্টার) কী হবে? তাঁরা তো কলেজ টেস্ট ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি। আর এক কলেজে এক একরকম প্রশ্ন। কোথাও নরম, কোথাও কড়া। দুই, বাকি ষণ্মাসগুলো নয় সিবিএসই-র ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী হবে। কিন্তু শেষ ষণ্মাসে? তিন, এক্ষেত্রে ইউজিসি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেছে। ৬ জুলাই নির্দেশিকা পাঠিয়েছে, শেষ পরীক্ষা নিতে হবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে। কীভাবে সম্ভব? ট্রেন বন্ধ, বাস ঠিকমতো চলছে না। পরীক্ষার্থীরা আসবেন কীভাবে? অধ্যাপকরা? তত্ত্বাবধায়ক হবেন?

অনলাইনে শিক্ষা বিদেশে সম্ভব। এদেশে এখনও নয়। মাত্র ৩৬ শতাংশ মানুষ নেট ব্যবহার করেন। বহু এলাকায় নেট নেই। আবার নেট ব্যবস্থা বিদ্যুৎ সংযোগ নির্ভর। মোবাইল নেট ভরসাযোগ্য নয়। এই আছে এই নেই। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী চলাই বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ, সমস্যা বেধেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে। ১৪ জুলাই থেকে ডাক্তারি পরীক্ষা নিতে হবে। ছাত্ররা আদালতে গেছেন। কীভাবে দেবেন সশরীরে পরীক্ষা? এই সময়ে? পরীক্ষাব্যবস্থাই পরীক্ষার মুখে। শিক্ষার অগস্ত্যযাত্রা।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

সংবিধান ও বর্তমান বিচারব্যবস্থা

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের সংবিধান যখন গৃহীত হল, সংবিধানের মুখবন্ধে স্বাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। দেশের গণতন্ত্র সুরক্ষিত রাখার জন্য স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, ব্যক্তি মর্যাদা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে দিয়েই ঐক্য স্থাপনের গ্যারেন্টি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সংবিধানকে কার্যকরী করার জন্য কিছু কিছু 'মৌখিক অধিকার' (Fandamental rights) হিসেবে স্বীকার করা হয়েছিল এবং কিছু বিষয় 'রাষ্ট্র নির্ণয়ের সূত্র' (Direct Principles of State Policy) চিহ্নিত করা হয়েছিল। 'মৌখিক অধিকার' রক্ষার জন্য সাংবিধানিক আদালত তৈরি করলেন। সুপ্রিম কোর্টকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তৈরি করা হল দেশের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রহরী হিসেবে। রাজ্যস্তরে হাইকোর্ট সাংবিধানিক আদালতে মৌখিক অধিকার-সহ অন্যান্য আইনি অধিকার রক্ষার দায় প্রাপ্ত হলেন। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য সাংবিধানিক আদালত তৈরি করা হল। সংবিধান প্রণেতারা এই দুই ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের কথা ভেবে ছিলেন, কারণ তারা জানতেন যে দেশের আইন প্রণয়ন (Legislature) ও প্রশাসন (Executive) সময় থেকে সময়ান্তরে বেআইনি কাজ ও সংবিধান বিরোধী কাজ করলে আদালত তাকে শুধরে দেবে। আদালতই হচ্ছেন মূলত সংবিধানের ব্যাখাকার ও রক্ষক।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট-সহ বিভিন্ন আদালত মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে সরব থেকেছেন। সুপ্রিম কোর্ট শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও বিক্ষোভ অধিকারকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং সেই অধিকার রক্ষার্থে নির্দেশিত লক্ষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে এবং বিক্ষোভ আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অধিকাংশ রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ধনবাদী ও সুবিধাভোগী পরিবারদের পক্ষে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এসবের বিরুদ্ধে মানুষ যখন বিক্ষোভ আন্দোলন করে তখন তাকে দমিয়ে রাখার জন্য দমনপীড়ন-সহ দেশবিরোধী কালাকানুন লাগু করা হয়। এই অসহায় মানুষের পক্ষে আদালতই একমাত্র সহায়ক ও বন্ধু হিসেবে সংবিধানের রক্ষক হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে, দুর্নীতির অভিযোগে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে বাতিল করে ইলাহাবাদ হাইকোর্ট, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট ইতিবাচক রায়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার সাহস দেখিয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধী পরবর্তী অবস্থায় সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করেছিলেন। ওই অবস্থা চলাকালীন মানুষের মৌলিক অধিকার প্রশাসনিক স্তরে লঙ্ঘিত হয়েছিল শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সেইসময় অধিকার লঙ্ঘনের পক্ষে নক্কারজনক অবস্থা নিয়েছিলেন। ADM Jabalpur বনাম Shivkant Sukla মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এক নক্কারজনক রায়ে স্বৈরাচারী শাসকের অধিকারকে মান্যতা দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী সময় অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। শাসক যখন দমনপীড়ন ও অধিকার ভঙ্গ করার সাহস দেখায় এবং গণআন্দোলন দুর্বল থাকে তখন ADM Jabalpur-এর মতো রায় পাওয়া যায়। পরবর্তী সময় গণআন্দোলন যত তীব্র হয়েছে ততই দেখা গেছে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়েছেন।

পুরোনো ইতিহাসের কথা বেশি আলোচনা না করলেও সাম্প্রতিককালে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদীদের উত্থানের পর বিভিন্ন আদালতে কিছু কিছু বিচারপতি তাদের রায়ে ভারতবর্ষে সংবিধানের মৌলিক চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে হিন্দুত্ববাদের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। মানুষের মৌলিক মুক্তচিন্তার অধিকারকেও হিন্দুত্ববাদী দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, রামজন্মভূমি রায় পড়লেই বোঝা যায় যে আইন ইতিহাস-তথ্য এসবকে উপেক্ষা করে হিন্দুত্ববাদীদের মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে একটি প্রাচীন সৌধ যা বাবরি মসজিদ নামে

খ্যাত তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ১৯৯২-এ। ওই জমিকে রক্ষার জন্য তৎকালীন সরকার অযোধ্যা জমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৯৩-এ চালু করার সময় সেই আইনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সময় বলেছিলেন— 'The demolition of the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure at Ayodhya on 6.12.1992 was a most reprehensible act. The perpetrators of this deed struck not only against a place at worship, but also at the principles of secularism, democracy and the rule of law enshrined in our constitution. In a more as sudden as it was shameful, a few thousand people managed to outrage the sentiments of millions of Indians of all communities who have reacted to this incident with anguish and dismay.

Today India seeks to deal, and not reopen its wounds', to look forward with hope, and not backwards with fear, to reconcile reason with faith. Above all, India is determined to press ahead with the National Agenda, undaterred by aberrations.' ভারতবর্ষের পূর্বতন বিচারপতি ভেঙ্কটচানাইয়া Law in a Pluralist Society-তে উল্লেখ করেছেন— 'The purpose of law in Plural Societies is not progressive assimilation of the minorities in the majoritarian milien. This would not solve the problem, but would vainly seek to dissolve it. What then is its purpose and again in the words at Lord Scarman (Minority Rights in a Plural Society, p. 63).

'The purpose of law must be not to extinguish the groups which make the society but to devise political, social and legal means of preventing them from falling apart and so destroying the plural society of which they are members.'

এতদসত্ত্বেও তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, সদ্য অবসর প্রাপ্ত বর্তমানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য ওইখানেই মন্দির নির্মাণ করবার জন্য অনুমতি দিলেন, ভারতের সংবিধানের মূল চরিত্র বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হল হিন্দুত্ববাদীদের জুলুমবাজিকে প্রশ্রয় দিয়ে।

সারা দেশ যখন নাগরিক সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন সেই মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টে শুনানির জন্য আর্জি করা হয় তখন সুপ্রিম কোর্ট দ্রুত শুনানি করতে অস্বীকার করেন। যা প্রকারান্তে উগ্রহিন্দুত্ববাদকে উৎসাহিত করে। ওই অগণতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধে মানুষের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে ভেঙে ফেলবার জন্য প্রশাসন যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে রায় দানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট দ্বিধা লক্ষ্য করা গেছে, আন্দোলনকারীদের বিনাবিচারে আটক করে রাখা হয়েছে। সে ভীমকোরেগাঁও হউক আর ক্যা বিরোধী হউক তাঁদের জামিনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে হেলদোল করছে না। জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের একাংশ বিচারপতি স্পষ্টত আন্দোলনকারীদের বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। অথচ হিন্দুত্ববাদী বিশৃঙ্খলাকারী বা ধর্মনকারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

বেশি উদাহরণ দিয়ে ভারাক্রান্ত না করলেও বিভিন্ন উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিককালের ক-টি রায়ে উল্লেখ করতেই হয়। একজন বিচারপতি ঠিক অবসরের আগে তাঁর রায়ে বললেন ময়ূরের চোখের জলে ময়ূরী সন্তান সম্ভবা হয়। এ ধরনের রায় প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান বিরোধী অন্ধ কুসংস্কারকে প্রতিফলিত করে। ধর্মীয় মৌলবাদীরা এই অবৈজ্ঞানিক ও অন্ধত্বকেই টিকিয়ে রাখতে চায়। আমাদের সংবিধানের নির্দিষ্টভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা ও বিজ্ঞানসম্মতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই রায়ে ওই বিচারপতি সংবিধানের পূর্তি মর্যাদার পরিবর্তে অবিজ্ঞানেই প্রশ্রয় দিলেন। অতি সম্প্রতি গৌহাটি হাইকোর্টের দুই বিচারপতি শাখা-সিঁদুর পরাকেই হিন্দু বিবাহের মূলমন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করলেন তাদের রায়ে। বিবাহ দুটি পরিণত মানুষের পারস্পরিক ব্যক্তিজীবন যাপনের আঙ্গিক মাত্র। তার সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় আচার-আচরণের কোনো সম্পর্ক নেই। মানব সমাজে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রকাশের সঙ্গে ধর্মীয় আচরণকে যুক্ত করা ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

বিভিন্ন ধর্ষণের মামলাতেও আমরা দেখেছি একাংশ বিচারপতির মানসিকতা পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিফলন। সেই জন্যই তো শুনতে হয় 'কুৎসিত মেয়েকে কেউ ধর্ষণ করে না'। এই জঘন্য পুরুষতান্ত্রিক উক্তি যে বিচারপতিরা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উগ্র মৌলবাদকে প্রশ্রয় নেয়। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত মহিলাদের সম্পর্কে বলে, 'ছেলেরা বিবাহ করে সুখ পাওয়ার জন্য, আর মেয়েরা বিয়ে করে ছেলেদের সুখ দেওয়ার বিনিময়ে নিজেদের পেট চালানোর জন্য'।

সেই মন্তব্যই বিচারপতিদের প্রভাবিত করেছে। হিন্দুত্ববাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ঝোঁক তৈরি করছে, তার প্রতিফলন এই বিচারপতিদের রায়ে প্রতিফলিত করছে। হিন্দু মৌলবাদীরা যে আদালতের কাছে প্রশ্রয় পাচ্ছেন তার প্রমাণ, কাশ্মীর বিধানসভাকে ভেঙে দিয়ে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একটি রাজ্যকে ভেঙে তিন টুকরো করে ফেলা হল এবং সেটি করা হল মূলত উগ্র হিন্দুত্ববাদের দৃষ্টিকোণ

থেকে। গোটা কাশ্মীরের জনগণকে বন্দি করে রাখা হল বন্দুকের ডগায় এবং তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

অথচ কাশ্মীরি মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কোনো হেলদোল লক্ষ্য করা গেল না। সুপ্রিম কোর্ট প্রকারান্তে হিন্দুত্ববাদীদের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিলেন। ইমার্জেন্সির সময় সুপ্রিম কোর্টের যে ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ে। এ প্রসঙ্গে মেঘালয়ের হাইকোর্টের এক বিচারপতি তিনি তাঁর রায়ে স্পষ্ট বলেছিলেন হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন একমাত্র মোদী। পরবর্তীকালে তীব্র সমালোচনার মুখে তিনি সেই মন্তব্য তাঁর রায় থেকে প্রত্যাহার করেন।

গণআন্দোলন তীব্র হলে বিচারপতিদের 'প্রগতিশীলতার' রূপ দেখা যায়, সাম্প্রতিককালে প্রবাসী শ্রমিকরা যখন অসহায় অবস্থায় মাইলের পর মাইল হাঁটছেন তখন আদালতের কিছু বিচারপতির মন্তব্য 'শ্রমিকেরা পথে হাঁটলে কোর্ট কী করতে পারে'। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিমূঢ় করেছিল। দেশব্যাপি তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই সমালোচনার ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি গোয়েলের নেতৃত্বে স্বতপ্রণোদিত হয়ে শ্রমিকের পক্ষে রায় দেন এবং তার ফলে সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা খানিকটা রক্ষা পেয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতা বারে বারে প্রমাণ করতে হবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি মর্যাদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ একটি বহুত্ববাদী দেশ, সংবিধান সে বহুত্ববাদকেই মর্যাদা দেয়। সেই বহুত্ববাদী সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদা না দিয়ে হিন্দুত্ববাদী ধ্যান-ধারণা যদি বিচারপতিরা প্রতিফলিত করেন তবে তা সংবিধানের প্রতি অমর্যাদা করা হবে।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

অনলাইন পড়াশোনা: একটু তর্ক হোক না

অনুরাধা রায়

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনলাইন ক্লাসে আপত্তি। যুক্তিসঙ্গত আপত্তি, কারণ তা ছাত্রদের মধ্যে 'ডিজিটাল ডিভাইড' তৈরি করবে। তবু আরো কিছু সহকর্মীর মতো আমিও এপ্রিল-মে মাসে কিছুদিন অনলাইন ক্লাস নিয়েছিলাম। সেটা একটা অপশনাল পেপার, ছোটো ক্লাস— মোটে ন-জনের। পিজি-টুর পরিণত সব ছাত্র-ছাত্রী, প্রত্যেকেই শহরের বাসিন্দা, প্রত্যেকেই ডিজিটালি কানেক্টেড; এবং খুব উৎসাহী। আমি বলতে গেলে প্রযুক্তি-প্রতিবন্ধী। ওরাই উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করেছিল। প্রথমে স্কাইপ, গুগল ডুও এইসব ডাউনলোড করলাম। কিন্তু কিছুতেই সবাইকে জোড়া গেল না। তখন স্রেফ কনফারেন্স কলের ব্যবস্থা করল। ওরা নিজেরা আগে কানেক্টেড হয়ে তারপর আমাকে জুড়ে নিত। মাঝে মাঝে মুশকিল হত। একেকজন কেটে যেত। আবার জুড়তে হত। একটু পুনরাবৃত্তি করতে হত।

অবশ্য এটা ছিল স্রেফ পড়ার জন্যেই পড়া। এই সেমেস্টার আদৌ গণ্য হবে কিনা, পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে কিনা, হলে কীভাবে হবে— সবটাই সেই সময়ে অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু 'আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা'-র পেপারে কাস্ট পড়াটা বাকি ছিল। ওরা তার জন্যে মুখিয়ে ছিল। ওদের হতাশ করতে চাইনি।

আমার বন্ধু একটি কলেজে পড়ায়। সেও কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছিল। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ৭০-৮০ জনের ক্লাস। অনেক ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম-মফসসলের দিকে থাকে। অনেকের কম্পিউটার বা স্মার্টফোন নেই, থাকলেও কানেকটিভিটি দুর্বল। ও এটাও বলছিল, ক-জন ছাত্র অনলাইন ক্লাস করছে অনেকক্ষেত্রে নাকি সেটা বাড়িয়ে দেখানোর চাপ আসছে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে। ৩০ শতাংশ তাই হয়ে যাচ্ছে ৯০ শতাংশ— সেটা হয়তো উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে খুশি করার জন্যে, অথবা শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যই। ও দুঃখ করছিল, ক্লাস করার মতো আলাদা ঘর আছে কতজনের বাড়িতে? তার ওপর ক্লাসরুমে বসেই অনেকে ঠিকমতো পড়া বুঝতে পারে না, অনলাইনে কতটা যে বুঝছে খুব সন্দেহ। সর্বোপরি ওর বক্তব্য, ক্লাসরুমে যে যার পারিবারিক-সামাজিক পটভূমি পিছনে ফেলে এসে একসঙ্গে বসে সবাই পড়াশোনা করত। এই অনলাইন চালু হয়ে শিক্ষাব্যবস্থার তথা সমাজের অসাম্যকে প্রকট করে দিল। সত্যি, অনলাইন নিয়ে আপত্তির অনেক যুক্তি আছে, যতই আমি নিজে অনলাইন ক্লাস নিয়ে থাকি। আমি জানি, আমাকেও যদি কম্পালসরি পেপারের ক্লাস নিতে হত অনেকটা একইরকম অভিজ্ঞতা হত।

প্রযুক্তির সুবিধে কতজন গ্রহণ করতে পারছে অথবা পারছে না, এই অসাম্যের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে এমনিতেই যদি পড়াশোনার সার্থকতা বিচার করি— স্বীকার করতে হবে, স্কুল-কলেজে গিয়ে পড়াশোনা জীবনে সমৃদ্ধির একটা অন্য মাত্রা যোগ করে। স্কুলের বাচ্চাদের জন্য অনলাইন ক্লাস তো আমি ভাবতেই পারি না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য 'সোশ্যালাইজ' করাও বটে, স্কুলে সেটা বিশেষ জরুরি। কিছু উচ্চ বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়ে নিজের বাড়িতে কম্পিউটারের সামনে সেজেগুজে বসে ক্লাস করবে— তাহলে তো তারা মানুষই হবে না। পৃথিবীটাই একেবারে স্বার্থপর, অসামাজিক হয়ে যাবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসও নিজের সমাজগণ্ডি ছাপিয়ে বড়ো একটা পৃথিবীতে এনে ফেলে ছাত্রদের; দৃষ্টিভঙ্গিটা বড়ো করে। নানান পটভূমি, নানান সংস্কৃতির ছাত্রদের মধ্যে মেলামেশা, বন্ধুত্বের সুযোগ দেয়। সেটা বাদ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। তবু আমার মনে হয়, শিক্ষার যত উঁচু স্তরে গিয়ে পৌঁছোবে ছেলে-মেয়েরা, ততই অফলাইনের সঙ্গে আংশিক অনলাইন হয়তো সম্ভব। তাও অনেক সমস্যা মানছি। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে কত সময়ে ছাত্রদের মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পারি, বুঝতে পারছে না। তখন অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি। আবার কত সময়ে কারোর চোখ চকচক করছে দেখে উৎসাহ পাই। আমার দিক থেকেও ওদের মোটিভেট করা সম্ভব হয়। সামনাসামনি পড়ানো অনেক স্বতঃস্ফূর্ত, তার অন্যরকম তৃপ্তি। ফোনে ক-দিন পড়াতে গিয়ে দেখছি বেশ চাপ পড়ে। একটা যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে,

সচেতনভাবে গলার স্বরকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা বেশ অস্বস্তিকর। তবু খুব চেষ্টা করি, গলার সঙ্গে নিজেকেও পৌঁছে দিতে। আর ওই যে বলছিলাম, আমার ছাত্ররা নিজেরাই খুব উৎসাহী— আলোচনা তর্ক সবই ফোনে হয়। তাই সবমিলিয়ে নিজের ক-দিনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে, অনলাইন ব্যাপারটা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোধহয় করাই যায়।

উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পে কর্মরত অনেক শ্রমিক নতুন যন্ত্রের বিরোধিতা করে সেসব ভাঙচুর করেছিল, তাদের বলা হত Luddite। সেই থেকে লাড্ডাইট বলতে চরম প্রযুক্তিবিরোধিতা বোঝায়। না, আমি লাড্ডাইটদের দলে পড়ি না। মানুষ তো প্রযুক্তি বা যন্ত্র ব্যবহার করবেই; তাকে তো বলাই হয় 'tool using animal'। কিন্তু দেখা দরকার, যন্ত্র যেন মানুষের চেয়ে বড়ো হয়ে না ওঠে। এজন্যে দুটো ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। প্রথমত, প্রযুক্তির দখল নিয়ে কিছু লোক যেন অন্য লোকদের ওপর আধিপত্য না করতে পারে, সমাজে অসাম্য যেন বৃদ্ধি না পায়— যে উদ্‌বেগ এখন অনেকেই প্রকাশ করছেন। দ্বিতীয় ব্যাপারটাতে খুব কথা হচ্ছে না বটে, কিন্তু সেটাও গুরুত্বপূর্ণ— এমন একটা ভাবনা মাথায় থাকা উচিত যে, যন্ত্র মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে লাঘব করুক, বা তার শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে পুষিয়ে দিক; কিন্তু আমার বোধবুদ্ধিকে, আমার নৈতিকতাকে যেন যন্ত্রের কাছে সমর্পণ না করি। আমি মনে করি, অনলাইন পড়াশোনা প্রসঙ্গে দুটো প্রশ্নের মোকাবিলাই জরুরি। আর এব্যাপারে আমি আগামী দিনের একটা টাইমলাইন ছকতে চাই— আজকের এই মুহূর্ত, অদূর ভবিষ্যৎ আর দূর ভবিষ্যৎ। এত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা আছি যে 'অদূর' মানে ক-মাসের ব্যাপার, 'দূর'-টাই বা ক-মাস বা ক-বছর পরে আসবে তা ঠিক নির্দিষ্টভাবে ছকে দেওয়া যাবে না। তবু নির্বিচারে অনলাইন আঁকড়ে ধরা বা তাকে বাতিল করে দেওয়ার চেয়ে বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা বোধহয় মন্দ হবে না।

অনলাইন কিন্তু ক্রমে বেশি বেশি করে ঢুকে পড়েছে পড়াশোনার জগতে, উত্তর-করোনা যুগে আরো পড়বে। ইতিমধ্যেই আমাদের ছাত্ররা অনেকে লাইব্রেরির থেকে বেশি নির্ভর করে নেটে লভ্য বইপত্রের ওপর (যদিও মোবাইল দূরের কথা, কম্পিউটারেই বা মানুষ কী করে গোটা গোটা বই পড়ে আমি বুঝতে পারি না!)। এরা সবাই যে খুব সচ্ছল পরিবারের তাও নয়। তবু এদের প্রজন্ম দেখি অনলাইনে মোটের ওপর বেশ স্বচ্ছন্দ। আমরাই কি পড়াশোনায় অনলাইন বাদ দিয়ে চলতে পারছি? গুগল, ই-মেল— এসব ছাড়া ক-জন অ্যাকাডেমিকের চলে? মননচর্চা থেকে হাত তুলে বসে থাকতে চাইলে আলাদা কথা, নইলে কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যে যথাসাধ্য অনলাইন হতেই হচ্ছে। *আরেক রকম*-ও তো শেষপর্যন্ত অনলাইন সংস্করণ বের করল। এই করোনাকালেও যে সারা পৃথিবীর ভাবনাচিন্তাগুলোর সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারছি, সেটা ইন্টারনেটের জন্যে। আজকাল খুব 'ওয়েবিনার' হচ্ছে, আগামী দিনেও হবে। আর আমি সেটাকে অনেক দূর পর্যন্ত সমর্থনও করি। একটা সেমিনারে ২০ মিনিট পেপার পড়বার জন্যে হাজার হাজার টাকা এয়ার ফেয়ার, হোটেল ইত্যাদিতে খরচ না করে ভিডিয়ো কনফারেন্স করলে সত্যিই অনেক অপচয় বাঁচে— সে খরচটা সরকার বা কোনো ফান্ডিং এজেন্সি বা ব্যক্তি যেই দিক না কেন। হ্যাঁ, দেশ-বিদেশে বেড়ানোটা হবে না বটে। কিন্তু বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে বেড়ানোর ধান্দা তো একরকমের অসততা।

তা, যে প্রযুক্তিগত সুবিধেটা আমরা, আমাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েরা পাচ্ছি, আমরা চাইব না সেটা সমাজের তলার দিকে চারিয়ে যাক? পিছিয়ে থাকাদের বরাবর পিছিয়ে রেখে অনুকম্পা দেখানোই কী আমাদের কাম্য? আমাদের গরিব দেশে গাড়ি ব্যাপারটা বিলাসিতা মনে হয়। কিন্তু পশ্চিমি দেশে যখন দেখি বাগানের মালি বা বাড়ির পরিচারিকা নিজের ছোটো গাড়িটা চালিয়ে কাজ করতে আসছে, ভালো লাগে না? মনে হয় না, আমাদের দেশেই-বা এসব পেশার লোক এই সুবিধেটা পাবে না কেন? এটা ঠিকই যে, প্রযুক্তি বরাবরই বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে ইতিহাসে— যারা তার দখল নিতে পেরেছে তাদের হাতে ক্ষমতা এনে দিয়েছে বেশি করে। এটা হয়ে আসছে সেই হাজার দশেক বছর আগে কৃষিপ্রযুক্তি চালু হবার সময় থেকেই। কিন্তু সেই বৈষম্যের মোকাবিলা করাই তো সভ্যতার চ্যালেঞ্জ হওয়া উচিত, তাই না?

অবশ্যই দুম করে মোকাবিলা করা যায় না। তাতে অনেক সমস্যা— এখন যেমন আমাদের অনলাইন ক্লাস নিতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এখানেই টাইমলাইনের প্রশ্ন আসে। এই সেমেস্টারে অনলাইন ক্লাস খুব একটা সুবিধের হল না। কিন্তু এরপরেও কী ব্যাপারটা থেকে আমরা একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকব? এই সেমেস্টারটা না হয় গোঁজামিল দেওয়া হল, পরের সেমেস্টারও কী সেরকমই হবে, নাকি ক্লাস চালুই হবে না? ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতির কথা ছেড়েই দিচ্ছি, বসে বসে মাইনে নিতে আমাদের শিক্ষকদেরও তো লজ্জা করার কথা! অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে— এখন তো বলা হচ্ছে 'live with Corona'— তাতে অদূর ভবিষ্যতে— যে দু-তিন মাস বা ছ-মাস যতদিন পরেই হোক— পড়াশোনা কিন্তু খানিকটা অনলাইন-নির্ভর হতে হবে বলেই মনে হয়। আমাদের ক্লাসরুমগুলো অসম্ভবরকম

ভিড়াক্রান্ত। সত্যি কথা বলতে কী, নেহাত অনেক ছেলে-মেয়েই নিয়মিত ক্লাসে আসে না, এলে জায়গায় কুলোতো না। এই চাপটা অনলাইন যদি একটু কমাতে পারে, মন্দ কী! কত দূর থেকে কত ছাত্র, শিক্ষক যাতায়াত করে; তাদের এনার্জি বাঁচবে, ফুয়েলও বাঁচবে। আবার, অনেকেই তো আছে যারা স্রেফ বেকার অভিধা ঘোচানোর জন্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখায়। অনলাইন ক্লাস হলে তারা সম্ভবত আর নামই লেখাবে না, সত্যিকারের অর্থবহ কোনো কাজ খুঁজে নেবে— যেটা তাদের পক্ষেও ভালো, সমাজেরও ভালো। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে তো করেসপন্ডেন্স কোর্স খুলে ছাত্রদের স্রেফ রিডিং মেটেরিয়াল পাঠিয়ে পড়ানো হচ্ছে, অনেক সময়ে রেগুলার ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একই ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে তাদের। সেটা তো দিব্যি মেনে নেওয়া হচ্ছে। কেন? সেটা অর্থোপার্জনের (প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিশিক্ষক উভয়েরই) সুযোগ বলে? করেসপন্ডেন্স কোর্সের চেয়ে তো অনেক ভালো হবে আংশিক অনলাইন পড়াশোনা— আদান-প্রদানের সুযোগ তো অনেক বেশি সেখানে? তাই আমার মনে হয়, খানিকটা পড়াশোনা অন্তত অনলাইনে করাই যায়। তবে এটাও ঠিক, অনলাইন ক্লাস যদি করতেই হয়, তার জন্য চিন্তা-ভাবনা এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

অনলাইন পড়া-পড়ানোর কতগুলো মডেল বানানো দরকার— অবস্থা বুঝে, অফলাইনের সঙ্গে তার অনুপাত ঠিক করে নিয়ে। ধরা যাক, একটা লক্ষ্য রাখা হল— প্রতি ইয়ারের ছেলে-মেয়েরা একদিন অন্তর ক্লাসে আসবে। সেইমতো কোর্স স্ট্রাকচার আর কন্টেন্ট সাজাতে হবে। এইভাবে পড়ানোর জন্যে কিছু স্টাডি মেটেরিয়ালও যোগান দেওয়ার প্রয়োজন হবে, তারও ব্যবস্থা দরকার। অবশ্যই বিষয় অনুযায়ী এসবের হেরফের হবে। যেমন, মানববিদ্যা আর বিজ্ঞানে তো বড়ো তফাত হবেই। কিন্তু এইসব চিন্তায় দায়িত্ব আমরা শিক্ষক হয়ে যদি এড়িয়ে যাই, সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে। আর সবার আগে, বলাবাহুল্য, পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ছাত্রের হাতে ল্যাপটপ, ট্যাব বা নিদেনপক্ষে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তথা সরকারকে দিয়েই এটা করাতে হবে। অনেক বাজে খরচ বন্ধ করে এটা কিন্তু করা যায় (যেমন আমার মনে হয়, তাৎপর্যহীন রিসার্চ প্রজেক্ট বা জমকালো সেমিনারের জন্য প্রচুর টাকার অনুদান, অথবা প্রতিষ্ঠানগুলোর র‍্যাঙ্কিং ঠিক করার খরচ)। প্রশাসক, নীতিনির্ধারকরা অনলাইনের ব্যাপারে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' রায় দিয়ে নিশ্চিন্ত না থেকে সরকারকে এই চাপটা বোধহয় দিতে পারেন। আর একবার এটা নিয়মের চেহারায় এসে গেলে অদূর ভবিষ্যৎ ছাপিয়ে দূর ভবিষ্যতেও থেকে যাবে। অবশ্যই এর প্রযুক্তিগত বাস্তবতার দিকটা মাথায় রাখতে হবে, তার জন্য প্রযুক্তিবিদরা আছেন। আর অবশ্যই ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে— মানে শুধুমাত্র মন্ত্রী-আমলা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটা হওয়া উচিত নয়। সব স্টেক-হোল্ডারদের— ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকদের— মত নেওয়া দরকার। সবাই মিলে ভেবেচিন্তে কয়েকটা মডেল হয়তো তৈরি করা যায়। তারজন্য এখনই যেটা দরকার— সমাজ জুড়ে বড়ো করে একটা আলোচনা আর তর্ক। আমি এখানে উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গেই আলোচনার একটা সামান্য সূত্রপাত করতে চাইছি। কিন্তু তেমন দরকার হলে স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রেও বোধহয় এটা করতে হবে— প্রাথমিকভাবে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই; কিন্তু পরে অনলাইন স্কুলের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও যাতে অসুবিধে নয়, সুবিধে হিসেবেই থেকে যায় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য পড়াশোনা বন্ধ করিয়ে বসিয়ে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। বিশেষ করে পিছিয়ে-থাকা পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের পড়ার অভ্যেস চলে গিয়ে তাতে আরো বেশি ক্ষতি হবে। আমার এক বন্ধু মানিকতলার খালধারের বস্তিতে বাচ্চাদের মধ্যে কাজ করেন। এটি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।

অনলাইন-অফলাইনের প্রসঙ্গ আজ না-হয় শিক্ষাব্যবস্থার অসাম্যকে প্রকট করে তুলেছে, কিন্তু এমনিতেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অসাম্যের চূড়ান্ত, যা মূলত আর্থসামাজিক অসাম্যের প্রতিফলন। কোনো ছাত্রের হাতে জরুরি প্রযুক্তি থাকা, কারোর তা না থাকাটাই তো বড়ো অসাম্য। ওই যে কথাটা উঠল— অনেক ছাত্রের বাড়িতে তো অনলাইনে ক্লাস করার মতো আলাদা ঘরই নেই, তার মানে কিন্তু এই যে সেইসব ছাত্র সন্ধেবেলা মন দিয়ে পড়াশোনা করার মতো নিভৃতিটুকু বাড়িতে পায় না। তার ওপর শিক্ষাব্যবস্থার অন্দরেই ইংলিশ মিডিয়াম-বাংলা মিডিয়াম আরো অসাম্য তৈরি করেছে। আমার ধারণা, এলিটরা সেটা ইচ্ছে করেই করেছেন। প্রযুক্তির ভেদাভেদটাও কী এলিটদের এলিটত্ব বজায় রাখার জন্যেই বরাবর ব্যবহার করতে চাইছি আমরা? শুধু প্রযুক্তি নয়, আমার তো অনেক দিক দিয়েই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ইচ্ছে করে— সিলেবাস, পড়া-পড়ানোর ধরন, ইত্যাদি। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় ছাত্ররা শিক্ষকদের ক্লাস লেকচারের ওপর খুব বেশি নির্ভর করবে কেন? তথ্য যোগান দেওয়ার কথা যদি ধরি সে তো থার্ডরেট শিক্ষা। চতুর্দিকে তথ্যের কোনো অভাব নেই। আমাদের তো কাজ হবে তথ্যগুলোকে যাচাই করতে শেখানো, কোন তথ্য অর্থবহ সেটা খুঁজে নিতে শেখানো, তথ্যের সঙ্গে তথ্য জুড়ে সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবতে শেখানো, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞার দিকে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া, তাদের স্বাধীন চিন্তা আর

সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো। আর এটাও আমার মনে হয়, ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছ থেকে যেমন শিখবে, শিক্ষকরাই-বা ছাত্রদের কাছ থেকে শিখবে না কেন? অন্তত আমি তো আমার ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি। আমাদের প্রজন্মের চোখে অনেক ঠুলি। ওদের অনেকেই দেখি অনেক মুক্তমনে চিন্তা করতে পারে। আসলে লকডাউনের গোড়া থেকে আমার মনে হচ্ছিল, শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সাধারণভাবেই করোনা হয়তো অন্যরকম একটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তৈরি করেছে— একটা সাম্যবাদী, সংবেদনশীল, সুন্দর ভবিষ্যৎ। মনে হচ্ছিল ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে সেই ভবিষ্যতের দিকে আমরা বোধহয় এগোনোর চেষ্টা করতে পারি। শিক্ষা নিয়েই বলুন, বা সাধারণভাবে সমাজ-সভ্যতা, এখনও যদি আমরা থোড়-বড়ি-খাড়া চিন্তা থেকে বেরোতে না পারি, আর কবে বেরোবো? সেইজন্যই এত কথা বলা।

অনলাইনের বিরুদ্ধেও কিন্তু যুক্তি আছে এবং সেগুলিও জোরালো— সেটা শুধু এখনকার জন্যেই নয়, বরং বিশেষ করে যদি একটু দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাই। অনলাইনে পড়া-পড়ানোর সুযোগ পেয়েই আমাদের অনেকের নিজেকে খুব উন্নততর প্রাণী বলে মনে হতে পারে, পড়ানোর চেয়ে টেকনলজির মোহটাই তখন বড়ো হয়ে যেতে পারে। আমাদের পিছিয়ে থাকা আদেখলা দেশে সেটা হলে অবাক হব না। আর ব্যাবসাদাররাও উঁচিয়ে আছে টেকনলজি প্রোমোট করে লাভের থলি ভরাতে। MHRD বা UGC-ও তাদের মদত করার জন্যেই হয়তো প্রযুক্তি প্রচলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবার কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে প্রযুক্তির ব্যবহারটাই তখন লক্ষ্য হয়ে যাবে (যেমন আমার প্রথমোক্ত বন্ধুর কলেজে হয়েছে)। আর আমরা যথারীতি সমাজের তরফ থেকে এব্যাপারে সরকারের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতেও পারব না (যেমন পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ বা আরো অনেক অন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পারিনি)। সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমাদের পাবলিক এডুকেশন আজও পর্যন্ত অনেক গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েকে উঠে আসার সুযোগ করে দিয়েছে, তাদের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে, যেটা সাধারণভাবে সমাজের বিকাশও বটে। আশঙ্কা করাই যায়, অনলাইন পড়াশোনা হলে সেটা অনেকটা কমে যাবে, হয়তো এলিটদেরই কুক্ষিগত হয়ে যাবে পড়াশোনা। ইতিমধ্যেই সরকার যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণের দিকে ঝুঁকেছে, অনলাইন হয়তো সেই প্রক্রিয়াটাকেই ফাস্ট ফরোয়ার্ড করবে। আমি বলতে বাধ্য, প্রযুক্তি যদি আমাদের সামাজিক ন্যায়ের বিপরীত দিকে নিয়ে যায় তবে তাকে বর্জন করাই ভালো। আমাদের ওপর তো আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো রেভেনিউ জেনারেট করার, সুতরাং 'Open or die'-এর চাপ নেই, আমরা না হয় ক-মাস ক্লাস-টাস বন্ধ করেই বসে রইলাম।

এবার শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়িয়ে অনলাইন ব্যাপারটা আরো বড়ো করে দেখা যাক। বেশ ক-বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রেই সাইবারস্পেসে কাজকর্ম করার প্রবণতা বাড়ছে। এবার করোনার অজুহাতে এসব যদি আরো ব্যাপক আর পাকাপোক্ত হয়ে যায়, সবমিলিয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হবে! ধরুন, আইটি সেক্টরে কোবোল কোড লিখেই সব কাজ সেরে ফেলা, কিংবা জিনিসপত্রের হোম ডেলিভারি, ড্রাইভারহীন গাড়ি-চালানো, এমনকী অনলাইন ডাক্তারিও। এতে কর্পোরেট পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠবে, কিন্তু সব কাজকর্মই হয়ে উঠবে মনহীন যান্ত্রিক। মানুষে মানুষে সম্পর্ক বলে কিছু থাকবেই না। ডাক্তারি বা শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে সেটা ভাবতেই ভয় করে। আর এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যটাও তো জানা। প্রচুর লোক বেকার হয়ে যাচ্ছে, আরো যাবে, রিসার্ভ ফোর্স হয়ে যাবে। শ্রমিক যারা থাকবে, মালিকরা তাদের যথেচ্ছ শোষণ করবে। ব্যাবসাদাররা, বিশেষত ডিজিটাল কর্পোরেশন, ভার্চুয়াল কোম্পানিগুলো তো তাই চাইছে। 'গিগ ইকনমি' তৈরি হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। সেটা হচ্ছে এমনকী শিক্ষাক্ষেত্রেও। আমেরিকায় তো যত অনলাইন পড়া হচ্ছে, ততই গিগ ইকনমি হচ্ছে। কিছু নামকরা প্রফেসর পার্মানেন্ট, আর সব টেম্পোরারি। একদম তলায় যারা, তারা নিছক 'ফেসিলিটেটর'। অন্যের ডিজাইন করা কোর্স যান্ত্রিকভাবে পড়ানোই তাদের কাজ।

অনলাইন মানুষকে তার শারীরিক সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করছে, দূরকে নিকট করছে— এই পর্যন্ত তবু হয়তো মানা গেল। কিন্তু সভ্যতার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার Al বা Artificial Inteligence-এর দিকটা যদি দেখি, সে কিন্তু আজ মানুষের মস্তিষ্কের কাজগুলোও করে দিচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের চেয়ে আরো ভালো করেই নাকি করছে। এইজন্যই তো বলা হচ্ছে, ডাক্তারিও অনলাইনে বেশি ভালো হচ্ছে, আমাদের মতো সেকেলে লোকদের তা যতই অপছন্দ হোক। শিক্ষাও হয়তো এই দিকে যেতে পারে। বস্তুত, আমরা জানি, Biotech আর Infotech মিলিয়ে আরো সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে। Bio-surveillance এখনই রীতিমত বাস্তব। Yuval Noah Harari-র '21 Lessons for 21st Century' বইটার প্রথম অধ্যায়ে এর একটা ছবি আছে। উনি দেখাচ্ছেন, কীভাবে মানুষকেই হ্যাক করা হচ্ছে প্রযুক্তির সাহায্যে— মানুষের অনুভূতিগুলোকে মানুষের চেয়েও ভালো করে বুঝে ফেলছে যন্ত্র। Big data algorithm জীবনটাকেই reshape, re-engineer করছে। শিক্ষাব্যবস্থাতেও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। উপরন্তু, শিগগিরি নাকি এমন দিন আসবে যে, যাদের পয়সা

আছে তারা এমনকী নিজেদের মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটাতে পারবে প্রযুক্তির সাহায্যে, আয়ু বাড়িয়ে নিতে পারবে। বলা যায় সুপারম্যান তৈরি হবে। কী সাংঘাতিক ডিজিটাল ডিভাইডই না হবে— শুধু শিক্ষা নয়, সমস্ত জগত জুড়ে! আর একটা জিনিসও হবে— এই বিগ ডেটা যাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, সাধারণ মানুষ তাদের হাতের পুতুল হয়ে যাবে। তারা হল কিছু রাজনীতিক আর তাদের বন্ধু ব্যাবসাদার। সরকার আর টেকনলজির কোম্পানিগুলো মিলে আমাদের জীবনের খুঁটিনাটির ওপর এখনই তো নজর রাখছে, আরো বেশি করে রাখবে। প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না। ওদিকে পাবলিক স্ফিয়ার, সিভিল সোসাইটিও থাকবে না। আমাদের নিজস্ব নির্জনতা, আত্মমর্যাদাবোধ এসব তো আমরা ক্রমেই বেশি করে সঁপে দিয়েছি ব্যাবসাদারদের হাতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার পাশাপাশি রক্তমাংসের মানুষ, মানুষে মানুষে পারস্পরিকতাও তো ক্রমেই বেশি বেশি করে ফালতু হয়ে যাচ্ছিল আমাদের জীবনে। সেই প্রক্রিয়াটাই হয়তো আরো সুবিধে পেয়ে যাবে এবার। সত্যি তো, আমরা ইতিমধ্যেই গুগল, অ্যাপেল, অ্যামাজনের দাস হয়ে গিয়েছি। হারারি বলছেন, যেমন দক্ষিণ আমেরিকার মানুষরা পুঁতির মালা বা ছুরি-কাঁচি পেয়ে খুব খুশি হয়ে নিজেদের দেশটা, বলতে গেলে নিজেদের সর্বস্বই তুলে দিয়েছিল স্প্যানিশ দস্যুদের হাতে, আমরাও তেমনি দ্রুত যোগাযোগ, একটা স্ক্রিনে শ-য়ে শ-য়ে আর্টিকল পড়ার সুযোগের বদলে এইসব কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

হারারির এই ছবিটা আমার অবশ্য এখনও একটু সায়ান্স ফিকশন স্টাফ মনে হয়— সেটা হয়তো আমি পিছিয়ে থাকা দেশের মানুষ বলে, নিজেও প্রযুক্তিতে তেমন দড় নই বলে। কিন্তু এদেশেও তো দেখছি মন্ত্রের মতো 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' জপে যাচ্ছেন অনেকে। করোনা এমন একটা দুনিয়াকেই দ্রুত সম্ভব করে তুলবে না তো! আমি এখনও পর্যন্ত সগর্বে দাবি করতে পারি যে, পড়ানোর মাধ্যম অনলাইন-অফলাইন যাই হোক না কেন, যা পড়াই তার ওপর কিন্তু আমারই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ, এই জায়গাটায় আমাকে কেউ প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। কিন্তু এরপর আমার মতো এক হতভাগা সাধারণ শিক্ষক হয়তো আর এটা বলার সুযোগ পাবে না। তার চিন্তাভাবনা, কীভাবে কী পড়াবে সবই হয়তো ঠিক করে দেবে ওপরওয়ালারা, অনলাইনের মাধ্যমে। ওই যে বললাম, এখনই আমেরিকায় যারা সবচেয়ে নিচের তলার শিক্ষক তাদের শিক্ষকও বলে না, বলে 'ফেসিলিটেটর'।

তাহলে আমাদের কর্তব্য কী? অবশ্যই এই পরিণতিটা ঠেকানো— শিক্ষার ক্ষেত্রেও বটে, সাধারণভাবে সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রেই। সর্বাগ্রে দরকার সমাজ সচেতনতা— কারণ সমাজচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষাচিন্তা অর্থহীন। এমন একটা সমাজ-অর্থনীতির দিকে এগোনোর তাগিদ থাকা দরকার, যেখানে প্রযুক্তি আর বিগ ডেটা-সহ মানব জগত আর প্রাকৃতিক জগতের যত সম্পদ সবকিছুর ওপর সাধারণ মানুষের দখল থাকবে। এই চিন্তাটাকে কী খুব পশ্চাৎপদ মনে হচ্ছে— সেই বাতিল হয়ে যাওয়া সমাজবাদ বা সাম্যবাদ? কিন্তু উলটোদিকে এমনও তো বলা যায়, আমরা কী এতদূর এগিয়ে ভাবতে রাজি আছি? তা যদি না ভাবি, তাহলে আর শিক্ষায় অনলাইন-অফলাইন আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। কর্তারা যেমন চালাবেন তেমনই চলব, বড়োজোর ব্যবস্থাটার মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধে খুঁজে নেব— যেমন ভারিক্কি কিছু বিদ্যায়তনিক পদ। সমাজের বড়ো বড়ো মননশীল ব্যক্তিরা কী এটাই হতে দেবেন? তার চেয়ে বিষয়টা নিয়ে একটু তর্কবিতর্ক করুন না, কর্তাদের ওপর একটু চাপ দিন না! করোনা কালকে শিক্ষা তথা সভ্যতার পক্ষে একটা নির্ণায়ক মুহূর্তে পরিণত করার একটা সুযোগ বোধহয় ছিল। সেই সুযোগ তাঁরা ছেড়ে দেবেন?

কোভিড-পরবর্তী মিডিয়ার পুনর্গঠন জরুরি

সম্বিত পাল

সাংবাদিকরা অনিশ্চয়তাকে ভালোবাসেন। কাল কী হবে, আজ জানা নেই। আজ বিকেলে কী হতে পারে, সকালে জানা নেই। কখনো কোথা থেকে কোন খবরটি উঠে আসবে, আর কোনটি শিরোনাম হবে, সেটা সবসময় জানা থাকে না। খবরের এই অনিশ্চয়তাকেই সাধারণত সাংবাদিকরা উপভোগ করেন। নিত্য নতুন ঘটনার কথা পাঠক বা দর্শকদের শুনিয়েই তাঁরা আনন্দ পান। প্রতিটি দিন একটি নতুন দিন হিসেবে শুরু হয়। আর যাঁরা পথে-ঘাটে খবর সংগ্রহ করার কাজ করেন, তাঁরা বিপদকেও ভালোবাসেন। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর তুলে আনার মধ্যে একটি তৃপ্তি থাকে।

কিন্তু কোভিড-১৯ শুধু সাংবাদিকদেরই নয়, পুরো মিডিয়া ব্যবস্থাকেই একটি ভয়ানক অনিশ্চয়তা ও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। বিষয়টি মোটেই 'উপভোগ' করার স্তরে নেই। এখানে মিডিয়া বলতে মূলত সংবাদমাধ্যমের বিষয়ই আলোচনা। জরুরি অবস্থা, দাঙ্গা, রাজনৈতিক হিংসা, যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণি ঝড়, জঙ্গি হামলা কভার করা সাংবাদিকরা কেউই ভাবেননি এমন লকডাউনের মুখোমুখি হতে হবে। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই মিডিয়া কর্মীরা কোভিড-১৯-এর মতো অজানা ভাইরাস ও তার পরবর্তী সারা দেশ স্তব্ধ করে দেওয়া লকডাউনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। করোনা যুদ্ধের সামনের সারিতে থাকা যোদ্ধাদের মধ্যে মিডিয়া কর্মীদের কথা উল্লেখ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তাতে বিশেষ শ্লাঘার কারণ ছিল না। সাংবাদিকরা এই যুদ্ধে নিজেদের শারীরিক ও পেশাদারি নিরাপত্তার ব্যবস্থা কী করে করবেন, তা কারও জানা ছিল না। তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও ছিল না। সবটাই ঠেকে শেখা।

কোভিড-১৯ লকডাউন যখন ২৫ মার্চ ২০২০-তে শুরু হল, তখন থেকেই মিডিয়ার বিপদের শুরু। প্রথমত, প্রায় গোটা দেশেই সংবাদপত্র ছাপানো বন্ধ করতে হল। 'খবরের কাগজ ভাইরাসের বাহক'— এই আতঙ্ক যেমন ছিল, তেমনই লকডাউনের সময় ঘরে ঘরে কাগজ সরবরাহ কীভাবে হবে, তা নিয়েও বিভ্রান্তি ছিল। শহরগুলির হাউজিং কমপ্লেক্সে কাগজের হকারদের ঢুকতে না দেওয়া থেকে শুরু করে ছাপাখানা থেকে দূর দূরান্তে খবরের কাগজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ধাক্কা খেল প্রথমেই।

দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের শারীরিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্‌বেগ। যাঁরা রিপোর্টার, তাঁরা কীভাবে কাজ করবেন মাঠে-ঘাটে গিয়ে, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। মাস্ক পরা বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি, সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বা সাংবাদিক সম্মেলনে দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করা, দিনের শেষে নিজেকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে বাড়িতে ঢোকো, অফিসকে জীবাণুমুক্ত রাখা, রিপোর্টারদের অফিসে বিশেষ আসতে না দেওয়া— এই প্রোটোকল তৈরি হতে লাগল ধীরে ধীরে। অন্যদিকে যাঁরা ডেস্কে কাজ করেন, তাঁদের শিফটে অফিসে আনা বা বাড়ি থেকে কাজের বন্দোবস্ত হল। যাঁরা নিউজরুমে একে অন্যের সঙ্গে মুখোমুখি যোগাযোগ রেখে কাজ করতে অভ্যস্ত, তাঁরা হঠাৎ করে ফোনে ফোনে কথা বলে, বাড়ি থেকে খবরের কাগজের পাতা তৈরি করতে গিয়ে অসুবিধায় তো পড়লেনই। এই ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগল।

তৃতীয়ত, সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, বিজ্ঞাপনে টান পড়ল। বিশেষত গাড়ি, রিয়েল এস্টেট, শিক্ষা ও ভোগ্যপণ্যের ব্যাবসা ধাক্কা খাওয়াতেই মিডিয়ার আয়ের পথ সংকুচিত হল। সংবাদপত্র, টিভি বা ডিজিটাল মিডিয়া সবাইকেই প্রধানত বিজ্ঞাপনের টাকাতেই সংসার চালাতে হয়। বিজ্ঞাপন কমে আসা বা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে চাপে পড়ল মিডিয়া কোম্পানিগুলি। বিশেষত সংবাদপত্রে এর ব্যাপক প্রভাব দেখা গেল। সঙ্গে সংবাদপত্র ছাপা বন্ধ হওয়াতে সেই চাপ বেশি করে এল সংবাদপত্রের কর্মীদের উপর। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে এদেশের সংবাদপত্রগুলি ২০,৬০০ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছিল, সেখানে ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটির হিসেব অনুযায়ী, কোভিড-১৯-এর কারণে সংবাদপত্র শিল্পে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলে ধরা হচ্ছে। 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠীর সিইও রয়টার্সের সাংবাদিককে জানিয়েছেন, তাঁদের আয়ের ৮০ থেকে

৮৫ শতাংশ আসে বিজ্ঞাপন থেকে এবং লকডাউনের ফলে সেই আয় প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে।

মূলত এই ত্রিফলা চাপে নাভিশ্বাস উঠল মিডিয়া ব্যবসায়। যার প্রথম ধাক্কা দেখা গেল কর্মী ছাঁটাইয়ে বা কর্মীদের বেতন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমানোয়। বিভিন্ন সংস্থায় মিডিয়া কর্মীরা এপ্রিল মাস থেকেই কম বেতন পেতে শুরু করেছেন বা কয়েক কিস্তিতে বেতন পাচ্ছেন। অন্যদিকে, 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'হিন্দুস্থান টাইমস', 'দ্য হিন্দু', 'দ্য টেলিগ্রাফ' থেকে শুরু করে কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'এই সময়'— সব সংস্থাতেই সাংবাদিক ও অ-সাংবাদিক কর্মীদের চাকরি যেতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বিভিন্ন সংস্করণ বন্ধ করে দিলেন। 'আউটলুক' ম্যাগাজিন তাঁদের ম্যাগাজিন ছাপা বন্ধ করে দিল। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র রবিবারের বিশেষ পাতা 'টাইমস লাইফ'-এর টিমকে ছাঁটাই করে দিল। 'দি টেলিগ্রাফ' তাদের উত্তর-পূর্বের সংস্করণ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। 'নিউজ নেশন' ইংরেজি ডিজিটাল টিমের সবাইকে বরখাস্ত করল। এরকম আরো উদাহরণ রয়েছে। যখন সংবাদপত্র ছাপা আবার আরম্ভ হয়েছে, তখন দেখা যাচ্ছে পাতার সংখ্যা কমে গেছে। যেমন 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ৪০ পাতা থেকে ১৬ পাতা হয়ে গেছে।

এটা যে শুধু আমাদের দেশে ঘটছে তা নয়। বিদেশেও সংবাদমাধ্যমে কর্মী ছাঁটাই বা সংস্করণ বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। বিলেতে বা আমেরিকায় এমনিতেই সংবাদপত্র শিল্প ধুঁকছিল। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার একটি রিপোর্ট বলছে, ২০০৪ থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮০০ ছোটো-বড়ো সংবাদপত্র বন্ধ হয়েছে আমেরিকায়। ওই রিপোর্টেই ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনার পেনি অ্যাবারন্যাথি বলছেন, সে দেশে আরো কয়েক শো সংবাদপত্র, 'দ্য টাম্পা বে টাইমস' সপ্তাহে দু-বার কাগজ ছাপাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন হারিয়েছে বলে খবর। ব্রিটেনেও খবরের কাগজের বিক্রি ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমে গেছে কোভিড-১৯-এর কারণে। তবে এই বিপদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে পাঠক বা দর্শক ডিজিটাল মাধ্যমে খবর পড়ছেন অনেক বেশি। টেলিভিশন চ্যানেলের দর্শকও বেড়ে গেছে এই লকডাউনের সময়। তার অন্যতম কারণ হল, সংবাদমাধ্যম যতই বিপন্ন হোক, সংবাদের চাহিদা বহু গুণ বেড়েছে এই অজানা ভাইরাসের আক্রমণে। মানুষ ভাইরাসের গতিবিধি ও লকডাউন পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়েছেন। পাশাপাশি বাড়িতে বন্দি থাকার কারণে স্মার্টফোন বা টিভিতে ভরসা রাখতে হয়েছে জনগণকে। সেখান থেকেই খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে। টিভি বা ডিজিটালে দর্শক সংখ্যা বাড়লেও, খবরের চ্যানেলের ক্ষেত্রে এপ্রিলে মাসিক বিজ্ঞাপনী আয় কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ডিজিটালে কমেছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। কিছু ব্র্যান্ড কোভিড-১৯-এর সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে হয় পণ্য বা পরিষেবা বিক্রির চেষ্টা করেছে বা সামাজিক দায়িত্ব পালনের মতো করে জনপরিষেবার বার্তা দিয়ে নিজেদের ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে।

টেলিভিশন রেটিং সংস্থা ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল বা বার্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, লকডাউন শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহ থেকেই টিভি ও ডিজিটাল মিডিয়ার দর্শক সংখ্যা বা ওই মাধ্যমে কাটানো সময় বাড়তে শুরু করেছে। ১৪ মার্চ থেকে ২০ মার্চের সপ্তাহে সাপ্তাহিক টিভি দেখার সময় বেড়েছিল ৮ শতাংশ (১১ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২০— এই সপ্তাহের নিরিখে)। নিয়েলসন গ্লোবাল মিডিয়ার প্রধান ডলি ঝা বলেছিলেন, তাঁরা চ্যাট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং নিউজ অ্যাপ বা সাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছেন। লকডাউন চলাকালীন আইআইএমসি ঢেঙ্কানালের ছাত্র-ছাত্রীদের করা একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটানো সময় আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। ডিজিটাল মিডিয়া রেটিং সংস্থা কমস্কোরের রিপোর্ট বলছে, এপ্রিলের শেষে ভারতে একজন ডিজিটাল ব্যবহারকারী মাসে ৩,৬০০ মিনিট ভার্চুয়াল দুনিয়ায় সময় কাটাচ্ছিলেন। যা একটি রেকর্ড। এর মধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সময় কাটানোর মাত্রা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খবর ও তথ্য সংক্রান্ত নেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ শতাংশ। কাজেই ডিজিটাল মিডিয়ায় বিনোদন ও গেমস ছাড়াও তথ্যের চাহিদা যে বহুগুণ বেড়েছে তা প্রমাণিত।

এর ফলে সংবাদপত্রও ধীরে ধীরে ডিজিটাল মিডিয়ার আশ্রয় খুঁজেছে। একদিকে খবরের কাগজ ছাপা বন্ধ হয়ে গেলেও, ই-পেপারের মাধ্যমে তারা পাঠকের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, সংবাদপত্র ব্যবসায়ীরা ডিজিটাল মিডিয়ার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। টেলিভিশনের খবর অবশ্য অনেক আগে থেকেই সামাজিক মাধ্যম ও ওয়েবসাইটের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্তিকরণের কাজ জোরদার করেছে।

ভবিষ্যৎ

এখন প্রশ্ন একটাই যে কোভিড-পরবর্তী সময়ে ভারতে মিডিয়ার ভবিষ্যৎ কী? এই আলোচনা কয়েকটি মূল বিন্দুতে করা যেতে পারে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা

সাংবাদিকদের জীবিকার নিরাপত্তা বিপন্ন এবং তার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা এখনই দেখা যাচ্ছে না। বিশেষত বিজ্ঞাপনের

জন্য যে ধাক্কা সংবাদপত্রে এসেছে, তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। কারণ, সামগ্রিকভাবে ভারতের অর্থনীতি কবে চাঙ্গা হবে তার কোনো হদিশ আপাতত নেই। সংবাদমাধ্যমের মালিকেরা নিজেদের ব্যাবসা পুনর্গঠনের চেষ্টায় যে নীচু তলার সংবাদকর্মীদের উপর কোপ বসাবেন তা দেখাই যাচ্ছে। যতক্ষণ না আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা আসছে, ততক্ষণ কর্মী ছাঁটাইয়ের বা বেতন কমানোর হিড়িক চলতে থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত, না তো সাংবাদিকদের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, না তাদের জন্য গলা ফাটানোর কোনো পক্ষ রয়েছে। সাংবাদিকদের কিছু সংগঠন মিউ মিউ করে এই ছাঁটাই ও কর্মীদের বেতন কমানোর বিরোধিতা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সংবাদপত্রের মালিকদের তাতে কিছু যায় আসে না। উপরন্তু সংবাদ কর্মীরা প্রায় সবাই চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন, ফলে তাঁদের আইনি রক্ষাকবচ নেই বললেই চলে। সাংবাদিকদের জন্য তৈরি ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যান্ড আদার নিউজ পেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশনস অফ সার্ভিস) অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিসনস অ্যাক্ট, ১৯৫৫-এর আওতায় প্রায় কোনো সাংবাদিকই আজকাল আসেন না। এই আইনের বলে তৈরি করা 'ওয়েজ বোর্ড' বা সংবাদপত্র মালিকেরা ওয়েজ বোর্ডের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার অনেক পথ বের করে ফেলেছেন। কাজেই কোনো সরকারি রক্ষাকবচ সাংবাদিকদের নেই।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রবীণ ও মধ্যবয়সী সাংবাদিকেরা চাকরি হারালেও নবীনদের ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হবে। হয়তো কয়েক মাস সময় লাগবে, কিন্তু নতুনরা সুযোগ পাবেন। কম খরচে বেশি কাজ পাওয়ার আশায় নবীনদের কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন বা চট করে তৈরি করে নিতে পারবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে চাকরিতে টিকে থাকার। শুধুমাত্র সংবাদপত্রে খবর লেখা বা পাতা তৈরির কাজ করা সংবাদকর্মীদের দিন ফুরিয়েছে। টিভিতে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে গিয়ে শুধু খবর সংগ্রহ করে রিপোর্ট করার দিনও ফুরিয়ে আসছে। একই সঙ্গে সংবাদপত্রের জন্য লেখা, ডিজিটাল বা টিভির জন্য ভিডিয়ো করা বা ইনফোগ্রাফিকস, ছবি, অডিয়ো প্যাকেজের মতো বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে কারও সাহায্য ছাড়াই স্টোরি করা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বোঝার কৌশল রপ্ত করতে হবে আধুনিক সাংবাদিকদের। চট করে অনলাইন থেকে তথ্য জোগাড় করে, অনলাইনেই সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই করে ২০০ শব্দের স্টোরি লিখে ফেলার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে। শুধু ২০০ শব্দ কেন! একটি তথ্যকে ৮০ শব্দ থেকে ৮০,০০০ শব্দে পরিবেশন করা, (সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বই) ছবি বা ভিডিয়ো বা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে সেই তথ্যের উপস্থাপনা করার কৌশল না জানলে সাংবাদিকরা এই পালটে যাওয়া জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না বেশিদিন। নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের বদলে নিতেই হবে। যেভাবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাহায্যে খবর তৈরি হচ্ছে, সেখানে প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। দেখাতে হবে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা। আর শারীরিক নিরাপত্তা বা এই ভাইরাসের সঙ্গে সহবাস করে বেঁচে থাকার পদ্ধতিও সাংবাদিকদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে সহ-নাগরিকদের মতো।

ডিজিটাল মাধ্যমের দর্শক বৃদ্ধি ও সংবাদপত্র

একথা বোধহয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানুষ এখন অভ্যাসে খবরের কাগজ পড়েন। ১৮ বছর থেকে ২৫ বছর বয়সী পাঠক কালেভদ্রে সংবাদপত্র উঠিয়ে দেখে থাকবেন। তাঁদের খবর পড়া বা শোনা মূলত সামাজিক মাধ্যমে বা বড়োজোর সংবাদ অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে। আর এই লকডাউন যেভাবে ডিজিটাল মাধ্যমের মোহ বাড়িয়েছে, কেপিএমজি সংস্থার একটি রিপোর্ট বলছে, সেই মোহ কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় নেই। অর্থাৎ বহু সংবাদপত্রের পাঠক আর সংবাদপত্র নাও কিনতে পারেন। ই-পেপার দেখেই সন্তুষ্ঠ হতে পারেন অথবা ফেসবুক ফিড বা হোয়াটসঅ্যাপ বা অ্যাপের মাধ্যমেই নিজের খবর খুঁজে নেবেন তাঁরা। সংবাদপত্রের মালিকদের এই সত্যটা বুঝে নিতে হবে। বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখর গুপ্তের দাবি, গত কয়েক বছর ধরেই সংবাদমাধ্যম ধুঁকছে। একটি গ্যাস বেলুনের মধ্যে মিডিয়া ব্যাবসা রয়েছে। কোভিড-১৯ এই গ্যাস বেলুনকে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। তবে তাঁর মতে, সংবাদপত্রগুলি বড়ো তাড়াতাড়ি কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা না করেই কোভিড-কে বাহানা বানিয়ে এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তবে এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ বের করতে হবে সংবাদপত্রের মালিকদেরই।

ভারতে গত কয়েক বছরে কম হলেও ২০১৮ সালের নিরিখে ২০১৯-এ সংবাদপত্রের বিক্রি থেকে আয় ৩.৪ শতাংশ বেড়েছে ও বিজ্ঞাপন থেকে আয় ৪.৫ শতাংশ বেড়েছে। কেপিএমজি-র এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই শ্লথ বৃদ্ধি বজায় থাকবে। কিন্তু কোভিডের আক্রমণের ব্যাপারে তখনও জানা ছিল না।

উল্লেখ্যযোগ্যভাবে এই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, ডিজিটাল মিডিয়া কিন্তু এই ব্যবসায় ভাগ বসাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র আক্রান্ত হচ্ছে। এর পরে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় আক্রমণ নেমে আসবে। এই যে সংবাদপত্রের বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছিল, তা কিন্তু মূলত ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রেই হচ্ছিল। ফলে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের মালিকেরা চেষ্টা করছেন ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব বাড়ানোর। টাকা দিয়ে যাঁরা গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের জন্য পে-ওয়ালের পিছনে কিছু বিশেষ খবর রাখা হচ্ছে, যেটা সাধারণ পাঠকরা পাবেন না। তবে এই ব্যবস্থায় টাকা রোজগার কঠিন। তাই বিষয়-ভিত্তিক ক্রোড়পত্র বা প্রকাশনা, কিছু অন-গ্রাউন্ড ইভেন্ট, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠকদের চিহ্নিত করে তাদের কাছে বিজ্ঞাপনদাতাদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সংবাদপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে অন্য সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে হাত মেলানোর মতো কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন সংবাদপত্র মালিকেরা। অনেকের মতে, সংবাদপত্রগুলির দামও বাড়ানো উচিত। তাহলে বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরতা কমবে। কিন্তু কম টাকায় কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ভারতীয়রা কি সেই দাম দিতে প্রস্তুত? যেখানে কাগজ পড়ার অভ্যেস কমছে এবং বিনা পয়সায় নেট থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে খবরের কাগজের দাম বাড়িয়ে বিশেষ লাভ হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্র মালিকদের এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতেই হবে।

কিন্তু ডিজিটাল মাধ্যমের আয়ের ক্ষেত্রে এক বছরে ৪৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি দেখানো হলেও, খবরের ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও ব্যাবসার পাকাপোক্ত মডেল এখনও তৈরি হয়নি। যদিও ধীরে ধীরে খবরকে পে-ওয়ালের পিছনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে সংবাদমাধ্যমগুলি। তবে তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। শেখর গুপ্তের কথায়, নিজের খবরের ব্র্যান্ডের উপর ভরসা থাকলে এটা করা সম্ভব হবে। 'দ্য হিন্দু', 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' বা বিদেশের 'নিউইয়র্ক টাইমস' বা 'ওয়াশিংটন পোস্ট' বা 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস'-এর মতো সংবাদমাধ্যম এটি করে দেখাচ্ছে। অনলাইনে ওদের খবর পড়তে হলে টাকা দিয়ে পড়তে হচ্ছে। আবার 'দ্য গার্ডিয়েন'-এর মতো বড়ো খবরের কাগজ তো পুরোপুরো পে-ওয়ালের পিছনে তাদের অনলাইন খবরকে নিয়ে যেতে পারেনি। তারা অনুদান চাইছে। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-এর মতো জনপ্রিয় খবরের মাধ্যম কী চাইবে তাদের পাঠকেরা টাকা দিয়ে অনলাইনে তাদের খবর পড়ুক, নাকি বিজ্ঞাপন ও অন্য ব্যাবসা থেকে তারা আয় বাড়াবে? অন্য কোনো ব্যাবসা ছাড়া শুধুই ডিজিটাল খবরের ব্যাবসা চালাতে গিয়ে কিন্তু সেই অনুদানের উপর ভরসা করতে হচ্ছে স্বাধীন খবরের ওয়েবসাইটগুলিকে। এর উপর, দেশের অন্যতম বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স গোষ্ঠী ভারতের মিডিয়া ব্যাবসার অনেকটাই নিজেদের দখলে রেখেছে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রিলায়েন্স ইন্ড্রাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভাতে কর্ণধার মুকেশ আম্বানির ভাষণেই দেখা যাচ্ছে এই গোষ্ঠী সারা দেশে ৭২টি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক। যা কিনা ৯৫ শতাংশ টিভির দর্শকের কাছে পৌঁছোয়। এদের নেটওয়ার্ক ১৮ ডিজিটাল মিডিয়াতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। মুকেশ আম্বানির দাবি, দেশের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন তাঁদের ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার করেন। সুতরাং ডিজিটাল ব্যবসায় চুনোপুটিদের টিঁকে থাকতে লড়াই করতে হবে।

অন্যদিকে, ডিজিটাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপনের টাকা সিংহভাগই ফেসবুক বা গুগল খেয়ে নেয়। খুব সামান্য অংশই খবরের প্রকাশকের কাছে এসে পৌঁছোয়। দর্শক বা পাঠক গুগুল বা ফেসবুকের মাধ্যমে খবর দেখলেও, তাতে খবরের প্রকাশকের লাভ খুব একটা হয় না। যদি দর্শক গুগুলের সার্চ ইঞ্জিনে কোনো খবর খুঁজে নিয়ে বা ফেসবুক থেকে কোনো খবরের ওয়েবসাইটে গেল, তাহলে তার থেকে পেজভিউ পেতে পারে সেই ওয়েবসাইটি। সেটা ভাঙিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের থেকে বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারে। কিন্তু ফেসবুকে বা গুগুলে সেই খবর উঠে আসার জন্য সরাসরি কোনো টাকা মিডিয়া কোম্পানিগুলি পায় না। অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সে আইন করে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে গুগুল ও ফেসবুক খবরের কোম্পানিগুলিকে তাদের বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের অংশ দেয়। জার্মানিতে সেই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। স্পেনে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে এমন আইন পাশ হওয়ার পরে গুগুল তাদের নিউজ সার্ভিসই সে দেশে বন্ধ করে দেয়। এই প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির দাবি তারা নিজেরা এই ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন করেছে যাতে দর্শক বা পাঠক তাদের প্ল্যাটফর্মে এসে খবর পায়। তার জন্য খবরের সংস্থাগুলিকে তারা কেন টাকা দিতে যাবে? তাছাড়া খবরের ওয়েবসাইটগুলো তো পেজভিউ পাচ্ছে। সেটা ভাঙিয়ে তারা রোজগার করুক। কোভিড-১৯-এর অসময়ে অবশ্য ফেসবুক ও গুগুল দুই সংস্থাই ধুঁকতে থাকে সংবাদ সংস্থাগুলিকে অনুদান দিয়ে সাহায্য করছে। অনেকেই বলছেন, এটা যথেষ্ট নয়।

তাই কোভিড-পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে তারা কীভাবে তাদের খবর সরবরাহের মডেল তৈরি করবে। কীভাবে তাদের ব্যাবসার মডেল তৈরি হবে।

ভুয়ো খবর ও মূল সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা

গত কয়েক বছরে কম টাকার স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ডাটার কারণে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান বহুগুণ বেড়েছে। আজকাল হাতে স্মার্টফোন থাকলেই যে কেউ সাংবাদিক হয়ে উঠছেন। মূল ধারার সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন স্তর ডিঙিয়ে কোনো তথ্য যে খবর হয়ে উঠত, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তা শিকেয় উঠেছে। সরাসরি তথ্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উঠছে, পৌঁছে যাচ্ছে জনগণের কাছে। কোনো বাঁধন ছাড়াই।

অন্যদিকে বিশ্বের অনেক দেশের মতোই ভারতীয় সমাজও মেরুকরণের ফাঁদে পড়েছে। মূল ধারার সংবাদমাধ্যমও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেই মেরুকরণকে তোল্লাই দিচ্ছে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থে। এই সব স্বার্থান্বেষী মহলের এবং 'ডিজিটাল মিডিয়া নিরক্ষর' ব্যক্তিদের জন্য ভুয়ো খবরের ছড়াছড়ি চারিদিকে। মানুষ এই মেরুকরণে এতটাই জর্জরিত যে তাঁরা সহজেই ভুয়ো খবরের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। অনেকেই আবার মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। সোশ্যাল মিডিয়ার খবরই তাঁদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। কোভিড-১৯-এর সময়ে এই ভুয়ো খবরের প্রকোপ আরো বেড়েছে। স্বাস্থ্য, ওষুধ, প্রতিষেধক, কুসংস্কার ও সর্বোপরি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আক্রমণের জন্য ভুয়ো খবরের ছড়াছড়ি দেখা গেছে এই সময়।

সামান্য হলেও আশার কথা, পাঠক বা দর্শক অবশ্য ধীরে ধীরে বিশ্বাসযোগ্য খবরের সন্ধান করা শুরু করেছেন। আইআইএমসি-র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা বলছেন, তাঁরা এই তথ্য বিস্ফোরণের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। প্রায় ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা দু-বার করে একটি তথ্য যাচাই করছেন এই কোভিড-১৯ লকডাউনের সময়ে। প্রায় ৬৮ শতাংশ বলছেন যে তাঁরা ডিজিটাল মাধ্যমের খবরকে হয় বিশ্বাস করেন না বা বিশ্বাস করবেন কিনা বুঝতে পারেন না। কোভিড-পরবর্তী সময়ে মূল ধারার সংবাদমাধ্যমের কাছে পাঠক-দর্শকদের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পাওয়ার এটি একটি বড়ো সুযোগ। আর স্থানীয় সংবাদের চাহিদাও একই সঙ্গে বাড়ছে। কাজেই স্থানীয় সংবাদের পরিকাঠামোকেও শক্তিশালী করা দরকার। তৃণমূলস্তরের খবরের প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকাঠামো ভুয়ো খবর রোখার জন্যও কাজে লাগতে পারে।

তবে সব শেষে বলা যায় যে, কোভিড-পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমের প্রকৃত অবস্থা কী হবে তা নির্ভর করবে সামগ্রিক অর্থনীতি কোন দিকে মোড় নেবে তার উপর। একই সঙ্গে অবশ্য সংবাদমাধ্যম ও তার কর্মীদের পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের পালটে নেওয়ারও একটি সুযোগ তৈরি করে দিল এই মহামারী। এর সদ্ব্যবহার কে কীভাবে করবেন বা কতটা করতে পারবেন, তা তাঁদের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করছে।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

নতুন প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সম্পর্ক

সাত্যকি রায়

উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাব, কাজের জগৎকে নতুনভাবে প্রভাবিত করতে চলেছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স্, রোবটিক্স এবং ইন্টারনেট অফ থিংস উৎপাদন ও যোগাযোগের কাঠামোকে গভীরভাবে পরিবর্তন করছে। প্রযুক্তির এই নতুন বিন্যাস শুধু যন্ত্র ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কেরই পরিবর্তন ঘটায় তা নয়, তা একই সঙ্গে মানুষ ও মানুষের সম্পর্ককেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানীদের বহুকাল আগেই একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, যে সমস্ত মানসিক চিন্তা বা কাজ যুক্তি বিন্যাসের (formal reasoning) দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব তার সবকটিকেই মেশিনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব। আধুনিক কম্পিউটারের আবিষ্কারের পর এই প্রতিস্থাপন অনেক গতি পেয়েছে— ছবি অথবা স্বরকে চেনা, রুটিন মাফিক কোম্পানির আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখা, সাধারণ আইনি চুক্তিপত্র তৈরি করা, রোগ নির্ণয়, ব্যাঙ্কের ঋণের আবেদন পরীক্ষা করা অথবা চাকরির আবেদন পরীক্ষা করা এসবই এখন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে মানুষের চেয়ে দ্রুত গতিতে ও বেশি দক্ষতার সঙ্গে করা সম্ভব। প্রযুক্তির এই নতুন ধরনের অগ্রগতি প্রধানত তিনটি কারণের জন্য সম্ভবপর হয়েছে। প্রথমত গণনার খরচ অস্বাভাবিক পরিমাণে কমে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ছোটো উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছে। কিন্তু বড়ো প্রশ্ন হল এই প্রযুক্তির ব্যবহার কর্মসংস্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করবে। ১৯৩০ সালে কেইন্স্ একটি প্রবন্ধে (Economic Possibilities for our Grandchildren) অনাগত ভবিষ্যতে প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতির সম্ভাবনা আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে আমরা এক নতুন ব্যাধির সম্মুখিন হতে চলেছি তা হল প্রযুক্তিগত কর্মহীনতা (technological unemployment)। এর প্রায় দু-দশক বাদে আরেক অর্থনীতিবিদ ওয়েসিলি লিওনটিয়েফ একইরকম ভবিষ্যতবাণী করে বলেন যে বিংশ শতাব্দিতে মেশিন অশ্বের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এবার মানুষকে প্রতিস্থাপন করবে মেশিন— শ্রমিকের গুরুত্ব ক্রমাগত কমে আসবে। এই ভবিষ্যতবাণী খুব একটা প্রমাণিত হয়েছে এমনটা নয়। এর প্রধান কারণ হল ঘোড়া আর মানুষ এক নয়— মানুষের দক্ষতা বহুমাত্রিক— একরকম কাজ প্রতিস্থাপিত হলেও আরেকরকম কাজের চাহিদা তৈরি হতে থাকে যেখানে শ্রমের ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ প্রযুক্তি ও শ্রমের প্রতিস্থাপন ব্যাপারটা অতটা একমুখী নয়। এমনকী কোনো একটি কাজকে প্রতিস্থাপিত করার মতো কোনো একটি যন্ত্র বাজারে এলেই উৎপাদক তা ব্যবহার করবে এরকমটা নয়। শ্রমের খরচ ও মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনের খরচ, সহযোগী পরিকাঠামো ও যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা ইত্যাদি নানাবিধ বিবেচনার উপরে কোনো প্রযুক্তির গণব্যবহার নির্ভর করে। নতুন প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্র ও মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক কীভাবে বদলাতে পারে তাই সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে।

নতুন প্রযুক্তির বহুমাত্রিক বিস্তার

মানুষের চিন্তাপদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত করে কতগুলি নির্দেশে রূপান্তরিত করতে পারলে কোনো কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে করানো সম্ভব— এই বিশেষ যান্ত্রিক ভাষায় নির্দেশ উপস্থিত করেই কম্পিউটারকে কাজে লাগান হত। এখন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এই নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে। বিপুল তথ্যসম্ভারের সাহায্যে ও সাধারণ অ্যালগরিদিম্ ব্যবহার করে নির্দেশ ছাড়াই মেশিন অনেক কাজ করতে পারছে। প্রথমত যে ধরনের কাজে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তা হল ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগ স্থাপন— বিভিন্ন ই-রিটেল

প্ল্যাটফর্ম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে। অ্যামাজন, এয়ার বিএনবি, ওলা বা উবের ইত্যাদিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার রকমফের ও প্রবণতা বিচার করে যোগাযোগ তৈরি করে এই প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির ব্যবহার আরো দুটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে তা হল, স্বর ও ছবি চেনার কাজে। ছবি চেনার কাজে মেশিনের ত্রুটি মাত্র ২ শতাংশে নেমে এসেছে এবং স্বর বুঝতে পারার কাজে (voice recognition) মেশিনের ত্রুটির মাত্রা ৫.৫ শতাংশ যা মানুষের ত্রুটির মাত্রা ৫ শতাংশ-এর খুব কাছাকাছি। এছাড়া এই প্রযুক্তির সাহায্যে ত্বকের ক্যান্সার নির্ণয়ের কাজ অনেক সহজ হয়ে এসেছে। বিভিন্ন কলসেন্টারে ৬০-৭০ শতাংশ প্রশ্নের ধরন কিছু সাধারণ প্রশ্নের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে এবং এর ধরন বিচার করে উত্তর দেওয়ার কাজ এখন মেশিনের সাহায্যেই করা সম্ভব। অনেক লেখার কাজেও ক্রমাগত মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। বিশেষত যে সমস্ত লেখার একটা বাঁধা গৎ আছে যেমন— কোনো আইনি চুক্তিপত্র লেখা, শেয়ার বাজারের উল্লম্ব পতনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টিং কোনো কোম্পানির ব্যালেন্স শিট রচনা— এসবের জন্য আর মানুষের খুব একটা প্রয়োজন হবে না। অনুবাদের কাজ এখন সহজেই মেশিনের সাহায্যে করা সম্ভব— ফেসবুক প্রতিদিন প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন অনুবাদ করে থাকে। এছাড়া ব্যাঙ্কে ঋণের আবেদনকারীর নথিপত্র পরীক্ষা করা, কর্মপ্রার্থীর আবেদন পরীক্ষা করা এসব কাজ অনেক জায়গাতেই মেশিনের সাহায্যে হচ্ছে। আরো জটিল কিছু ক্ষেত্রে এআই-এর ব্যবহার হচ্ছে যেমন ইলেকট্রিক গ্রিড ম্যানেজমেন্ট অথবা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বাকি নেই ছবি আঁকা বা সংগীত সৃষ্টি। গত বছরই দিল্লিতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে রোবটের ব্যবহার। ২০১৫ সালে আনুমানিক ১৫ লক্ষ থেকে ১৭.৫ লক্ষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট ব্যবহৃত হয়েছে এবং ২০২৫-এ এই সংখ্যা ৪০ থেকে ৬০ লক্ষে পৌঁছোবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মেশিনিং, ওয়েলডিং, পেইন্টিং এবং প্রধানত ভারি মেশিন, ও মানপত্র বহন ও সাজানোর কাজে রোবটের ব্যবহার দ্রুত গতিতে বাড়ছে। রোবটের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে (৩৯ শতাংশ) এছাড়া ইলেকট্রনিক্স (১৯ শতাংশ), ধাতুশিল্প (৯ শতাংশ) প্লাস্টিক এবং রাসায়নিক ক্ষেত্রে (৯ শতাংশ) রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনকার দিনে কী করতে হবে এই ভিডিয়ো দেখালে রোবট নিজে নিজেই সেই কাজ শিখে নিচ্ছে— বাড়ির দৈনন্দিন বেশ কিছু কাজ যেমন সব পরিষ্কার করা ইত্যাদিতে রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা এও জানি যে এআই-এর সাহায্যে চালকবিহীন গাড়ি এবং ট্রাক ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। এতে অবশ্যই চালকদের কাজ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, অন্যদিকে অনেকে মনে করছেন গাড়ি পিছু পরিষেবা প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এর কারণ হল গড়ে কোনো গাড়ি ৯৫ শতাংশ সময়ে পার্কিং-এ অব্যবহৃত থাকে। কোনো একটি এলাকায় যার যেরকম প্রয়োজন হবে সেই সময় অনুযায়ী চালকবিহীন গাড়িকে ডেকে নেওয়া সম্ভব এবং তার ফলে একই গাড়ি অনেক মানুষকে পরিষেবা দিতে পারবে। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি ক্রমাগত যে আশঙ্কাকে গভীর করে তুলছে তা হল এই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ আগামী দিনে কাজ হারাতে চলেছে।

প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান

নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের সংকোচনের আশঙ্কা নতুন কিছু নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি কীভাবে বেশকিছু ক্ষেত্রে মানুষের কাজের প্রাসঙ্গিকতাকে নষ্ট করতে চলেছে এ নিয়ে বিস্তর গবেষণাও চলছে। প্রধানত যে সমস্ত কাজ রুটিন মাফিক ও একইরকম সেইসব ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা প্রবল। আইএলও-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭ শতাংশ ও ব্রিটেনে ৩৫ শতাংশ কাজ আগামী ২০ বছরে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ ও চিনের মত দেশে যেখানে উৎপাদন অনেকবেশি শ্রম নিবিড় সেখানে এই প্রভাব আরো গভীর। ভারতে ৬৯ শতাংশ ও চিনের ৭৭ শতাংশ বর্তমান কাজ আগামী ২০ বছরে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। অনেকের মতে Cloud based solution বিস্তারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশে কর্মকাণ্ড স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে। একইভাবে রোবটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোবটের দাম কমে আসছে আবার অন্যদিকে বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশে শ্রমের মজুরির হার ঊর্ধ্বমুখী। ফলে উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন স্থানান্তরিত করার যে সুবিধা ছিল তাও কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। অতএব এই সমস্ত দেশে কর্মসংস্থানের বড়োরকম সঙ্কোচন আসন্ন।

নতুন প্রযুক্তি কর্মসংস্থানকে প্রধানত তিনরকমভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত, সরাসরি মেশিনের দ্বারা মানুষের প্রতিস্থাপন— ফলে বেশকিছু ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষ কাজ হারাবে। দ্বিতীয়ত, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সহযোগী কাজ ও দক্ষতার চাহিদা বাড়তে পারে। যেমন কম্পিউটারের

ব্যবহারের ফলে সরাসরি কিছু লোক কাজ হারালেও কম্পিউটার ও তার যন্ত্রাংশ, সফ্‌টওয়্যার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক নতুন ধরনের কাজের ক্ষেত্রও উন্মুক্ত হয়েছে। এ ঘটনা ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের সময়ও ঘটেছিল। বয়নশিল্পে প্রথম যন্ত্র ব্যবহার হওয়ার কারণে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় যার ফলস্বরূপ সুতো তৈরির কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং যেহেতু সুতো তৈরির ক্ষেত্রে যন্ত্র তখনও ব্যবহৃত হয়নি ফলে ওই ক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মূল কথাটা হল আনুসঙ্গিক কাজকর্মে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। তৃতীয়ত, প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে জিনিসের দাম কমে যাবে এবং মানুষের প্রকৃত আয় তার ফলে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের অন্যান্য জিনিসের চাহিদা বাড়তে পারে এবং তা ওই সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান ঘটাতে পারে। বিশেষত যে সমস্ত জিনিস বা পরিষেবার ক্ষেত্রে চাহিদা দামের সাপেক্ষে বিশেষ সংবেদনশীল হয়— সেক্ষেত্রে দাম কমার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি এতটাই ঘটতে পারে যে সরাসরি কর্মচ্যুতির পরিমাণের চেয়ে বর্ধিত চাহিদার কারণে নতুন কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ব্যাঙ্কের ATM চালু হওয়ায় সরাসরি যত কাজ নষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ কাজ তৈরি হয়েছে শহরের শহরতলীতে ATM-এর ব্যাপক বিস্তারের ফলে। অনেক সময় অটোমেশানের গভীরতা বৃদ্ধি পেতে পারে— অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মেশিনের ব্যবহার আগেও ছিল কিন্তু আরো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হওয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেল অথচ নতুন করে ওই ক্ষেত্রে কেউ কাজ হারাল না, এক্ষেত্রে বর্ধিত উৎপাদনশীলতার প্রভাব যদি যথেষ্ট পরিমাণে হয় তাহলেও মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যান্য জিনিসের চাহিদা বাড়তে পারে।

এইসমস্ত সম্ভাবনাগুলি কীভাবে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব ফেলবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদনশীলতা যে গতিতে বৃদ্ধি পায় শ্রমিকের মজুরির হার সেই গতিতে বাড়ে না। তাই মোটের উপর উৎপাদিত মূল্যে শ্রমের অংশ কমতে থাকে। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি শ্রমিকের ব্যবহার ও মজুরি তুলনামূলক বেশি হয় তবে মোটের উপর শ্রমের অংশ অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন হল যে প্রযুক্তি কেন একটি সম্পূর্ণ কাজকে প্রতিস্থাপিত করে না— অনেকক্ষেত্রেই ওই কাজের একটি বা একাধিক অংশ বা টাস্‌ক অটোমেটেড হয়ে থাকে ফলে পুরো কাজটাই মেশিনের দ্বারা করা হবে এরকম নয়। আবার এরকমও হতে পারে যে প্রযুক্তি ব্যবহারে যে পরিমাণ কর্মসঙ্কোচন হল তাকে মেটানোর জন্য যে পরিমাণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হলে বর্ধিত আয়জনিত কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারত তা হল না। অথবা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে চাহিদা বৃদ্ধির প্রভাব সবক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটবে এরকমও কোনো কথা নেই। এছাড়া নতুন প্রযুক্তি যে ধরনের দক্ষতা দাবি করে তা রাতারাতি অর্থনীতিতে তৈরি হয়ে যায় এরকমও নয়। নতুন কাজের সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে প্রয়োজনীয় দক্ষতার তালমিল ঘটানোর মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান তৈরি হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলস্বরূপ কর্মসঙ্কোচন ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে যে কথাটা অবশ্যই বলা প্রয়োজন, কোনো একটি প্রযুক্তি বাজারে এলেই উৎপাদক তা ব্যবহার করবে তার নিশ্চয়তা নেই। যদি শ্রমিকের মজুরি ক্রমাগত কমতে থাকে তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের গতিও একটা পর্যায়ের পর থমকে যেতে পারে। তার কারণ একদিকে যেমন মোট চাহিদার সঙ্কোচন হবে। অন্যদিকে উৎপাদক যদি দেখে সস্তা শ্রম ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে এবং তা যন্ত্রের ব্যবহারের চেয়েও কম খরচে উৎপাদন করে দিতে পারবে তা হলে প্রযুক্তির ব্যবহারের গতিও কমে আসবে। অর্থাৎ প্রযুক্তির ব্যবহারের গতিটি উৎপাদকের লাভের অঙ্ক থেকে বিযুক্ত নয় এবং মজুরির মাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

নতুন প্রযুক্তি ও পুঁজি সম্পর্ক

সাম্প্রতিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার পৃথিবীতে অতীতে ঘটে যাওয়া প্রযুক্তি বিপ্লবের থেকে কিছুটা আলাদা এবং তার বিস্তারের ধরনেও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথমত যেটা বলা দরকার যে এমন কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে, যা প্রায় সমস্ত ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আলোড়িত বা প্রভাবিত করে। যেমন স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবহার, কমবাশন ইঞ্জিন অথবা কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি সবই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল— এজন্যে এদের General Purpose Technology বলা হয়ে থাকে। এআই রোবটিক্‌স বা ইন্টারনেট ওফ থিংস এখনও এই পর্যায় পৌঁছোতে পারেনি। যেটা আরো লক্ষণীয় তা হল এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সাধারণ উৎপাদনশীলতা যে বৃদ্ধি পেয়েছে একথা বলা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ থেকে ২০০৪— এই সময়কালে উৎপাদনশীলনতা বৃদ্ধির গড় হার ছিল ২.৮ শতাংশ অথচ ২০০৫ থেকে ২০১৬ এই সময়ে গড়

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার কমে ১.৩ শতাংশ হয়ে যায়। OECD প্রায় ২৪টি উন্নত দেশের প্রবণতা লক্ষ করে দেখায় যে তাদের গড় বার্ষিক উৎপাদনশীলতার হার ২.৩ শতাংশ (১৯৯৫-২০০৪) থেকে কমে ১.১ শতাংশ (২০০৫-২০১৬) হয়েছে। এটা কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলেও বাস্তব। Robert Solow, এই বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেন তাই একে Solow Paradox বলা হয়। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে এটা গণনার সমস্যা অর্থাৎ প্রযুক্তির সমস্ত সুফলগুলিকে এখনও তথ্যের পরিমাপে ধরা যাচ্ছে না ফলে তা উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির অঙ্কে প্রতিফলিত হচ্ছে না। কিন্তু একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে নতুন প্রযুক্তি এখনও উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়নি। অনেকের মতে এরকম ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে আগে একটা ন্যূনতম ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করা দরকার যা পেরোলেই দ্রুত গতিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের বিস্তার ঘটে থাকে। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও সেই মাত্রা অতিক্রম করেনি।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো বিষয় হল সাম্প্রতিক প্রযুক্তির বিস্তারের গতি অতীতের প্রযুক্তি বিপ্লবের তুলনায় কম। এর একটা প্রধান কারণ হল প্রযুক্তির প্রকৃতি ও বিস্তারের ধরন। মনে রাখা দরকার ইউরোপে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের সময় অদক্ষ শ্রমিকের বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে কৃষিতে উদ্‌বৃত্ত হওয়া মানুষ শিল্প, খনি ও নির্মাণকাজের শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সংগঠনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জটিল কাজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল টাস্‌কে রূপান্তরিত করা হয়, যাকে Taylorism বলা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আসলে শ্রমিকের দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কমানো হয় (deskilling) এবং বিপুল অদক্ষ শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৭০ দশকের পর থেকে দেখা গেল প্রযুক্তি উদ্ভাবন মূলত দক্ষতা ও জ্ঞান নির্ভর। এর একটা অন্যতম কারণ হল বিভিন্ন দেশে শিক্ষার সাধারণ মানের বৃদ্ধি শিক্ষিত ও দক্ষ মানুষের যোগান বৃদ্ধি করে যাকে ব্যবহার করার সুযোগ নিতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন দক্ষতা নির্ভর হয়ে উঠল।

এর ফলে যে সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠল তা হল জ্ঞান নির্ভর উদ্ভাবনের উপর মালিকানা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সমস্যা ও বাজারের মাধ্যমে বিস্তারলাভ করার অসুবিধা। অন্যান্য সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে জ্ঞানের পার্থক্য হল এই যে knowledge-এর প্রকৃতি non-rival। এবং এই কারণে জ্ঞানের বিস্তার, তাকে কুক্ষিগত করে কখনোই সম্ভব নয়। উলটে যত বেশি মানুষ তার চিন্তার আদান-প্রদান করবে, জ্ঞান নির্ভর উৎপাদনের বিস্তার তত দ্রুততার সঙ্গে হবে।

আমাদের সবার অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে যে বিশ্বের এক সুবিপুল তথ্য ও জ্ঞান ভাণ্ডার আজ আমাদের কাছে বিনামূল্যেই ইন্টারনেটের সাহায্যে উপস্থিত হচ্ছে। এবং আজকের প্রযুক্তিতে কোনো একটি উৎপাদন তা যাই হোক না কেন— গান, ফিল্ম, বই ইত্যাদি একবার ডিজিটাইজ করার পর তার অগুন্তি প্রতিলিপি তৈরি করতে খরচ প্রায় শূন্য। সেক্ষেত্রে উৎপাদককে যদি কাউকে ওই সমস্ত জিনিস ব্যবহারের জন্য দাম চাইতে হয় তার একমাত্র রাস্তা হল উৎপাদিত সৃষ্টির উপর মালিকানা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, কোনোভাবে একটা প্রাচীর তৈরি করা যা অতিক্রম করতে গেলে নির্দিষ্ট দাম দিতে হবে। এই মালিকানা সত্ত্ব নির্দিষ্ট না হলে বাজারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার বিস্তার হওয়া খুব কঠিন। অথচ জ্ঞাননির্ভর উৎপাদন তখনই দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে যখন তা অন্যের সঙ্গে সহজেই আদান-প্রদান করা সম্ভবপর হয়। জ্ঞান আদান প্রদান করলে অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের মতো তা খরচ হয়ে যায় না বরং তা আসলে বৃদ্ধি পায়। একারণেই অতীতের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলির বিস্তার (diffusion) বাজারের সাহায্যে যতটা সহজে ঘটেছিল বর্তমান প্রযুক্তির ধরনের কারণে তা ওইভাবে সম্ভবপর হচ্ছে না। অন্যদিকে এই প্রযুক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সহযোগী ক্ষেত্রেও যেহেতু অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম, ফলে সমাজের বিপুল অংশের মানুষ এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কার্যত অপ্রয়োজনীয়ই থেকে যাবে।

পরিশেষে নতুন প্রযুক্তিও সমাজ সংগঠন সম্পর্কে দুটি বিষয় নজরে আনতে চাই। প্রথমত এটা পরিষ্কার যে দক্ষতা ও জ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তির বিকাশ তখনই দ্রুততার সঙ্গে ঘটবে যখন অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার মুক্ত আদান-প্রদান সম্ভব হবে। এমনকী এ.আই.এর সাহায্যে মেশিন যে দক্ষতা অর্জন করছে (machine learning) তা আদান-প্রদান অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে ক্লাউড কম্পিউটার-এর সাহায্যে। তাই প্রযুক্তির প্রভাবকে কুক্ষিগত করা আসলে এর বিকাশেরই পরিপন্থী। পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্ক ক্রমাগত নতুন প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে বেমানান হয়ে পড়ছে। এই সমস্যা মোকাবিলা করতেই আন্তর্জাতিক স্তরে মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত চার-পাঁচটা বৃহৎ কোম্পানি যেমন, Google, Amazon ও Facebook পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এদের মধ্যে লড়াই চলছে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে মুক্ত আদান-প্রদান ও জ্ঞানের উপরে সামাজিক

মালিকানাই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি কখনোই মানুষের শত্রু নয়। মানব সভ্যতার বিকাশে সামগ্রিক জ্ঞানের ফসল হিসেবে বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন মোটের উপর মানুষের কায়িক শ্রমকে কমিয়ে আনার কাজ করেছে। ফলে বাঁচার তাগিদে প্রায়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের সময় কমে আসবে এবং মানুষের পছন্দের কাজের সময় বাড়বে এই বাস্তবতা প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে যেন তার উলটোটাই ঘটছে। ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ কর্মসঙ্কোচনের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে কর্মরত মানুষের কাজের সময় কমার জায়গায় বেড়েছে। এর আসল কারণ হল প্রযুক্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বেঁচে যাওয়া সময় বা উৎপাদিত বর্দ্ধিত পণ্য ও পরিষেবাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করা। এর ফলে প্রযুক্তির সৃষ্টি ও সাফল্য পুঁজির অধীনেই থেকে যায়। তা সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবন উন্নত করার মাধ্যম হিসেবে প্রতিভাত হয় না।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

Covid-19 এবং অথ পরিযায়ী কথা

ব্যাসদেব দাশগুপ্ত

দুর্গা ঠাকুর যখন আমরা দেখি তখন আমরা প্রতিমার মুখ দেখি যে কাঠামোয় প্রতিমাটি নির্মিত তা আমরা দেখতে পাই না। অনেকটা মার্কস বর্ণিত fetishism। ঠিক তেমনই বলা চলে বর্তমান ভারতে উৎপন্ন অসংখ্য পণ্য (commodity) সম্পর্কে। এর একটা গরিষ্ঠ অংশ পরিযায়ী শ্রমের ফসল। আমরা এই তথ্যটা জানতাম না যদি-না করোনা অতিমারি আমাদের দেখাতে বাধ্য করত। বলা যেতে পারে ভারতীয় অর্থনীতি পরিযায়ী শ্রমিক ও তার শ্রমের উপর নির্ভরশীল।

সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী প্রায় দশ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র ১০ শতাংশ উৎপাদন করে। এই পরিয়ায়ীরা অধিকাংশই আন্তঃরাজ্য শ্রমিক অর্থাৎ এরা এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

আমাদের জানা নেই এই মুহূর্তে সারা দেশে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত? ২০১১-র জনগণনার হিসেবে এই সংখ্যাটা ১৩.৯ কোটি। অর্থাৎ ১৪০ কোটির দেশে ১৩ কোটিই পরিযায়ী শ্রমিক।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর হিসেব অনুযায়ী করোনা অতিমারির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৮ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। মোদ্দা কথা হল দেশে পরিযায়ী শ্রমিক সংখ্যা কত তা নিয়ে এখনও অবধি কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। অথচ ১৯৭৯ সালে জনতা পার্টি সরকার দ্বারা প্রণীত আন্তঃরাজ্য শ্রমিক আইন মোতাবেক এই পরিসংখ্যান সরকারের রাখার কথা এবং পরিযায়ী শ্রমিকের স্বার্থে কিছু করার কথা। বলাই বাহুল্য যে, আজ পর্যন্ত সব সরকারই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

পুঁজিবাদ নিয়ে মার্কসীয় ব্যাখ্যা মেনে নিলে বলা চলে ভারতের এই বিপুল পরিযায়ী শ্রমিক কতিপয়ের (পুঁজিপতি) জন্য উদ্‌বৃত্ত মূল্য সৃজনে নিমগ্ন— যে উদ্‌বৃত্ত এই কতিপয়ের বিশাল ধনরাশির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়।

করোনা পরিপ্রেক্ষিত আমাদের সকলের চোখের সামনে তুলে ধরল কর্মহীন-উপার্জনহীন-সম্পদহীন কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের সারি— যারা নিরুপায় মাইলের পর মাইল হেঁটে নিজেদের গৃহ বা পরিবারমুখী পথেই মারা পড়ল অনেকে। লকডাউন যখন ঘোষিত হল তখন একবারের জন্য কোনো সরকার ভাবল না এদের কথা। নাকি শুরুতে ভাবা হয়েছিল যে লকডাউন হবে ক্ষণস্থায়ী। কাজেই অচিরেই এই পরিযায়ীরা কতিপয়ের জন্য উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনে সম্পৃক্ত হবে।

আমরা চিন্তিত হলাম লকডাউন ঘোষণার প্রায় একমাস পরে যখন পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল নেমেছে রাস্তায়। কেননা, তখন তারা আর উদ্‌বৃত্তের উৎপাদক নন, তারা আমাদের জনস্বাস্থ্যের পরাকাষ্টা। ঠিক যেমনটা এঙ্গেলস শ্রমিকদের Housing Questions নিয়ে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের স্বার্থে আঘাত পড়ল ততক্ষণ আমরা ভাবিওনি, জানতেও চাইনি পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্পর্কে।

পরিযায়ী শ্রমিকের একটা বড়ো অংশই উদ্‌বৃত্ত মূল্য উৎপাদনে ন্যস্ত। কিন্তু সরকারি বা রাষ্ট্রীয় স্তরে কোনো প্রচেষ্টাই নেই তাদের পরিসংখ্যান তৈরি করাতে কিংবা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের মূল্যায়নে। বরং আমরা করোনা অতিমারির ছলে দেখলাম বেশ কিছু রাজ্য সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করল— যার মধ্যে অন্যতম হল দৈনিক কাজের সময়ের বৃদ্ধি (৮ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা)। যদিও বর্তমানের নয়া উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই দৈনিক কাজের সময় আর ৮ ঘণ্টা নেই এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিককে বঞ্চিত করা হয় অতিরিক্ত কার্য সময়ের (over time) মজুরি থেকে।

একটু তলিয়ে দেখা যাক ভারতের পরিযায়ী-নির্ভর অর্থব্যবস্থাকে। এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের বিভিন্ন সংগঠিত (formal) এবং অসংগঠিত (informal) ক্ষেত্রে কর্মরত। এদের একটা বড়ো অংশ আবার স্ব-নিযুক্ত (self-employed)। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্পর্কে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ:

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিযায়ী শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত (অর্থাৎ দৈনিক মজুরি ছাড়া তারা আর অন্য কোনো সুবিধা পান

না)। আবার যারা সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত তারা প্রায় সবাই ঠিকা শ্রমিক, স্থায়ী শ্রমিক নয়।

২. দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় এই শ্রমিকেরা আসেন না। ১৯৭৯ সালের আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকবিধি এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন প্রযোজ্য ১৯৭০ সালের চুক্তি শ্রম (contract labour) আইন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকারই এই আইন দুটির সদর্থক প্রয়োগ করেনি।

৩. এই পরিযায়ী শ্রমিকের একটা বড়ো অংশের কর্মস্থানের কোনো নির্দিষ্টতা নেই অর্থাৎ এরা footloose labour বিশেষ করে যারা নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই এদেরকে কোনো স্থায়ী শ্রমিক সংগঠনের আওতায় আনা খুবই দুরূহ একটি কাজ। এরা এক শহর থেকে অন্য শহরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভ্রাম্যমান এবং এদের সকলেরই 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা।

৪. যেহেতু এই শ্রমিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনো শ্রম আইনের আওতায় পড়ে না (উপরি উক্ত দুটি আইন ছাড়া) কাজেই এদের কোনো সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। কাজ করলে পয়সা, কাজ না করলে নেই কোনো পয়সা। অথচ এরাই দেশের প্রকৃত সম্পদের স্রষ্টা।

৫. এমনটা নয় যে পরিযায়ী শ্রমিকেরা প্রত্যেকেই তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে রাজ্যন্তরে পাড়ি জমিয়েছেন। করোনা অতিমারি দেখাল যে এদের পরিবার পরিজন তাদের ভিটেমাটি যেখানে আছে (অধিকাংশই গ্রামে) সেখানেই আছে। কাজেই এরা একরকম একাকী থেকে কাজ করে ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের তাগিদে।

সাম্প্রতিক কিছু পরিসংখ্যান বলে (অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে) যে পরিযায়ী শ্রমিকের অবদান ভারতীয় জাতীয় সম্পদ সৃষ্টিতে বছরে ১০ শতাংশ। এই শতাংশের হিসেব মনে হয় ১০-এর বেশিই হবে। কিন্তু ২৪ মার্চ ২০২০ সালে তারা আমাদের চোখের সামনে ছিলেন অদৃশ্য। একেই কী বলে অদৃষ্ট! এপ্রিলের শেষের দিকে যখন এরা ভিড় জমাতে শুরু করলো রেল-স্টেশনে, বাস-আড্ডায় কিংবা পথে বাড়ি ফেরার তাগিদে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে তখন আমরা ভয় পেলাম। কেননা এদের দ্বারা আমরা সংক্রমিত হবো না তো! ঘুম ভাঙলো আমাদের। কিন্তু সত্যিই ভাঙলো কি?

আমরা এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মার্কসকে অবলম্বন করে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একদল উদ্‌বৃত্ত মূল্যের উৎপাদক। অপর দল বিভিন্ন পুঁজিবাদী শ্রেণি প্রক্রিয়াকে ইন্ধন দিয়ে চলা সম্পৃক্ত শ্রেণি (subsumed class) ভুক্ত। ভুললে চলবে না বর্তমানে ভারতের মোট শ্রমজীবী মানুষের ৫১ শতাংশ স্বনিযুক্ত এবং এদের একটা বড়ো অংশ পরিযায়ী। অন্যান্য শ্রমিকের মতো পরিযায়ী শ্রমিকেরাও হল উৎপাদনের মূল ঝুঁকি বহনকারী। অর্থাৎ এরা যেমন উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন করে তেমনই যখন পুঁজিবাদ সংকটে পড়ে তখন এরা তার ঝুঁকিও সামলায়, পুঁজিপতি নয়। নয়া অর্থনৈতিক উদারবাদের এ এক অমোঘ নিয়ম যেন বিগত চার দশক ধরে গোটা বিশ্বে পরিলক্ষিত।

আমরা যদি বিগত তিন দশকের শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির একটা ছবি আঁকি তা হলে দেখতে পাবো এই তিন দশকে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যেমন বেড়েছে তেমনই কমেছে তার প্রকৃত মজুরি। পরিযায়ী শ্রমিকেরা এর ব্যতিক্রম হবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তাই একদিকে যেমন সম্পূর্ণ এবং আপেক্ষিক উদ্‌বৃত্তের হার ক্রমবর্ধমান তখন শ্রমশক্তির মূল্য ক্রমহ্রাসমান। পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা যে আরো শোচনীয় তা কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

করোনা অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে তিন ধরনের সংকটের উল্লেখ করা চলে— ১. জনস্বাস্থ্যের সংকট, ২. পরিযায়ী সংকট এবং ৩. ভারতীয় অর্থনীতিতে গভীর মন্দার সংকট। পরিযায়ী সংকট অন্য দুটি সংকটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিযায়ী শ্রমিকেরা যে জনস্বাস্থ্যের সংকটের একটা অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াবে এমনটা বোধহয় রাষ্ট্রের লব্ধ জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আবার অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পরিযায়ীরাই কর্মচ্যুত। লকডাউন করে তুলেছে তাদের জীবিকাহীন, সম্পদহীন, সহায়হীন— সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাদের একমাত্র গন্তব্য তাই তাদের ফেলে-আসা পরিবার, ফেলে-আসা গ্রাম। কিন্তু করোনা প্রেক্ষাপটে তাদের হঠাৎ দৃশ্যমানতা ভারতীয় রাষ্ট্রের তথাকথিত 'উদার গণতান্ত্রিক' আবহে যেন আঘাত এনেছে।

আজকের পরিযায়ী সংকটকে এক কথায় বলা চলে মানবিক সংকট। মানবিকতা এখানে বিপর্যস্ত। মানবিক সংকট তখনই দেখা দেয় যখন এই সংকটের ফলে ব্যক্তি মানুষের জনস্বাস্থ্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমান পরিযায়ী সংকট তাই একটি মানবিক সংকট। যে-সংকটের সমাধান মানবিকতার মধ্যে খুঁজে পেতে হবে। যে-মানবিকতা ethics of care-কে সামনে তুলে ধরবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা করে তুলতে পারলো কি? Stranded Workers Action Network পরিযায়ী শ্রমিকের করোনা-পরিপ্রেক্ষিত সংকটকে ইতিমধ্যেই মানবিক সংকট বলে তুলে ধরেছে। এ-সংকটের উত্তর তাই খোঁজা উচিত ছিল মানবিকতার মধ্যে। কিন্তু আজ অবধি ঘোষিত সরকারি নীতিগুলির মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ একপ্রকার অজ্ঞাত।

যখনই কোনো মানবিক সংকট উদ্ভূত হয় তখন নৈতিকতা দাবি করে যে যারা এই সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত তারা যেন যথাযথ খাদ্য, বাসস্থান, জল, শৌচালয় এবং জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য রাষ্ট্রের থেকে পায়। লকডাউন পর্বে ঘোষিত সরকারি সহায়তায় এরা বলতে গেলে অনুপস্থিত। তাই প্রশ্ন কী

জাতীয় 'মানবিক' সাহায্য পরিযায়ীরা পেল রাষ্ট্রের থেকে? নাকি শুধু থালা বাজিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে 'আমি আছি তোমার পাশে' বলে আমরা ক্ষান্ত হব? যে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চলল পরিযায়ীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবার জন্য তা বিনা মূল্যের করা গেল না। ট্রেনে মিলল না পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার, জল এবং উপর্যুপরি জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা। আমরা তারই মধ্যে ঘোষণা করলাম যে আমরা 'আত্মনির্ভর' হব। যে আত্মনির্ভরতা পরিযায়ী শ্রমের বর্তমান সঙ্গীন দশাকে হয়তো বা বহাল রাখবে। কেননা এরই ফাঁকে উঠে এল শ্রম-আইনের পরিবর্তন— বিশেষত দৈনিক কাজের সময়কে বাড়িয়ে করে তোলা হল ১২ ঘণ্টা বেশ কিছু রাজ্যে। এটাই তো বোধহয় 'ভাবের, ঘরে চুরি করার' উপযুক্ত সময়! কাজেই পরিযায়ী শ্রমিকের মানবিক সংকট আরো ঘনীভূত হল রাষ্ট্রীয় উপেক্ষায়!

কী পাওয়ার কথা পরিযায়ীদের রাষ্ট্রের থেকে— ১. কর্মসংস্থান, ২. ভারতীয় নাগরিক হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা, ৩. পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান, ৪. যথাযথ মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং ৫. বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা। WHO ১১ মার্চ ২০২০ করোনা-কে অতিমারি রূপে ঘোষণা করে। সেইদিন থেকে ধরে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি সহায়তায় দেখা গেল না যে শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিক সংকটের অবসানের কথা ভারত রাষ্ট্র ভেবেছে। আগামী দিনই বলবে ভারতীয় অর্থনীতি কোন অভিমুখে বাহিত হবে। কিন্তু এটা বোধহয় নিশ্চিত করে বলা চলে পরিযায়ী যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। প্রশ্ন থাকে বিকল্পের অনুসন্ধানের। কিন্তু সেই বিকল্পে থাকবে কি পরিযায়ী শ্রমিকের কণ্ঠ?

'আমি কান পেতে রই...'

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

রঙিন ছলনা

প্রতিভা সরকার

এ কথা ভাবলে খুবই আশ্চর্য হতে হয় যে শাঁখা-সিঁদুরের জন্য সবচেয়ে লালায়িত সোনাগাছির মেয়েরা। তারা অনেকেই চওড়া করে সিঁদুর পরে। হাত-ভরতি শাঁখা-পলা। কথা বলে দেখেছি নিষিদ্ধ বস্তু, যা হাতের নাগালের বাইরে, তার প্রতি একটি শিশুর যেমন টান, এয়োস্ত্রীর চিহ্নগুলির প্রতি এদেরও তেমন।

—রাস্তায় দাঁড়াই যখন, পুলিশ যদি গেরস্ত ঘরের বউ ভাবে, তাহলে খেদাবে না।

একজন বলছিল।

এলাকার পুলিশ আর কিছু না হোক পয়সার টানেই এলাকার সব যৌনকর্মীর মুখ চিনে রাখে একথা যেন কেউ বোঝে না। চেপে ধরতে আর একজন বলল,

—ব্যাঙ্ক পোস্টঅফিস বাজার বা রেশনের দোকানে সবাই ঘেন্না ঘেন্না করে তাকাত এগুলো না থাকলে।

সে আর লোকে ক-দিনই-বা যাচ্ছে, তার জন্য বার মাস সিঁথি রাঙাতে হবে! আমি অবাক হচ্ছি দেখে এবার শুনলাম,

—না না, ও আমাদের ভালো লাগে, তাই। কমলাকে দেখেছ? শাঁখা-সিঁদুরে যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গা। ফ্যাটফ্যাটে সিঁথি থাকলে অত সুন্দর লাগতো? মেয়েদের রূপ খোলতাই হয় শাঁখা-সিঁদুরে।

তবে আমার ধারণা সমাজ তাদের যে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে কমলারা তা একটু হলেও ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে এইভাবে। আর এ পাড়ায় প্রকাশ্যে আগমন নির্গমন দূরে থাক, এদের নিয়ে আলোচনাও হারাম এই বিবেচনায় কোনো সমাজপতিই কোনোরকম ফতোয়া কখনো দেয়নি। নাহলে এই মরীচিকাও কমলাদের হাতছাড়া হতে বেশি সময় লাগত না। তবে হাওয়া যেমন, তাতে কেউ সোনাগাছির মাঝখানে ঝান্ডা গেড়ে, আজ থেকে বারবণিতাদের শাঁখা-সিঁদুর পরা বন্ধ এই ফরমান দিয়ে এলে আশ্চর্য হব না। কারণ প্রগতির চাকাকে পেছনদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে শাঁখা-সিঁদুর কত পূত পবিত্র, হিন্দু বিবাহের কত অবিচ্ছেদ্য অংশ এটা প্রমাণে লোকজন বেজায় ব্যস্ত। বিশেষত গৌহাটি উচ্চ আদালতের রায়ের পর।

বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তায় গ্রিন ভার্জের ওপর ফুলের বাগান করছিল বছরখানেক আগে। বাহারি ফুল পাতার গাছ। তা আবার মোটা বাখারির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই বেড়া যে মহিলারা খালি হাতেই বিশ্রি কেমিক্যাল রঙে রাঙাচ্ছিল তাদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করছিল, সধবা তো সিঁথিতে আমার সিঁদুর নেই কেন। আমি সিঁদুরে মেশানো পারায় চুল ওঠা ও সিঁথির আশপাশ সাদা হয়ে যাবার কথা বলতে তারা অবিশ্বাসের মুচকি হাসি হাসল। বলল,

—তোমার তো এখনও সাদা হয়নি, হলে দেখা যেত।

কথায় কথায় বেরিয়ে এল যে মেয়েটি সবচেয়ে চওড়া সিঁদুর পরেছে সে স্বামীপরিত্যক্তা। এইবার আমি চেপে ধরতে সে খুব করুণমুখে জানাল এই চিহ্নগুলি তার কামোফ্লাজ। দুর্জনের কুদৃষ্টি এড়াবার জন্য সে এইগুলি ব্যবহার করে। ভাঙর থেকেও কয়েক কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে তার বাড়ি। সারাদিনে আসা-যাওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির ঠিকেদার থেকে শুরু করে সহকর্মীদের নিয়ে শতাধিক পুরুষের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ। তাদের মধ্যে কে ভালো, কে খারাপ তা তো সে জানে না। ঘরে স্বামী আছে জানলে যদি স্বস্তি মেলে। তাছাড়া গাঁ ঘরে সিঁদুর শাঁখা না পরলে ভারি নিন্দে। স্বামী সঙ্গে থাকে না পরস্ত্রী নিয়ে নতুন সংসার পেতেছে ওসব কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। বিবাহিত 'মেয়েছেলে'-কে সিঁদুর পরতেই হবে। তার মানে মেয়েদের সর্বশেষ পরিচয় হচ্ছে সে একজন পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একমাত্র সেই অবস্থাতেই অন্যের লোলুপ দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব।

এই মেয়েটি অবশ্য স্বীকার করেছিল সিঁদুর শুধু তার আড়াল নয়, দুর্বলতাও। তাকে ছেড়ে গেছে তো কী হয়েছে, স্বামীর মঙ্গলকামনা সে এখনও করে।

এই মানসিক অবস্থাটি অবশ্যই সমাজ দ্বারা উপ্ত বীজ যা কালেক্রমে ডালপালা ছড়িয়ে মহীরুহ হয় এবং পতি স্বর্গ, পতি ধর্ম মনোভাবকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ দেয়। শাঁখা-সিঁদুর মানে বিবাহিত, উলটো মানে নয়, এই বন্দোবস্তকে কায়েম করতে মেয়েদেরই বেশি উৎসাহ। ত্রিশ বছর আগে এগুলো

ছাড়তে গিয়ে বিরোধিতা পেয়েছি শুধু বর্ষিয়সীদের কাছ থেকে নয়। আত্মীয় এবং সম্পর্কে সন্তানতুল্য কিশোরীরাও সমালোচনা করেছে শাঁখা-সিঁদুরের খামতি বা সালোয়ার-কুর্তা নিয়ে। পিতৃতন্ত্র কত তাড়াতাড়ি শেকড় ছড়ায় ভাবলে অবাক হতে হয়। এভাবে ভাবতে তাদেরকে শেখানো হয়েছে, তাই তারা ভেবেছে। এখন তারা পরিণতবয়স্ক। তাদের মুক্ত সিঁথি ও মিনিস্কার্ট দেখে যুদ্ধজয়ের উল্লাস অনুভব করি। তবে পিতৃতন্ত্রের শেকল তারা কাটিয়েছে এমন আশা বিন্দুমাত্রও নেই। অন্তর্জগতে সে পরিবর্তন এলে শুধু পোশাক পরিচ্ছদে নয়, জীবনের সর্বত্র তার ছাপ থাকে। তাই মনে হয় এইরকম ক্ষেত্রে এগুলো এখন অনেকাংশে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। যারা আদর্শিক কারণে বা বাহুল্য বিবেচনায় বর্জন করেন তাদের কথা আলাদা। সেইরকম মেয়েই অন্তত শহরে বেশি বলে আমার বিশ্বাস।

ফ্যাশন স্টেটমেন্ট সিঁদুর পরাও। গৌহাটি হাইকোর্টের রায় বেরুবার পর দলে দলে মেয়েরা বলতে লাগল সিঁদুর পরলে সুন্দর দেখায় তাই পরি। ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচ করে পলার রঙ, শাঁখার সঙ্গে কনট্রাস্ট করে পলা, সবই নাকি সৌন্দর্যের খাতিরে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠেছে তাহলে অবিবাহিতেরা কেন পরবে না? তাদের সৌন্দর্যবোধ কী কম? বিবাহবিচ্ছিন্নারাই-বা কী দোষ করল! বিয়ের সঙ্গে সামাজিকভাবে শাঁখা-সিঁদুরকে জড়িয়ে দেবার যত চেষ্টা হয়েছে, এমনকী বিয়ের আংটিকেও ততটা নয়। মেয়েদের ওপর সব সামাজিকতার দায় চাপিয়ে পুরুষ মুক্ত থাকতে চেয়েছে। পেরেওছে। তাকে প্রশ্ন করবার হিম্মত নারীর নেই, থাকা উচিতও নয়। তাই তার অনামিকায় বিয়ের আংটি আছে কিনা তা দেখতে কোনো ফতোয়া নেই, লোকনিন্দাও না। আর এটাই যে স্বাভাবিক তা কবুল করিয়ে নেওয়া হয়েছে মেয়েদেরকে দিয়েই। সিঁদুর না পরা যে পরম্পরাবিরোধী এবং অন্যায় আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেয়েই সে ব্যাপারে একমত। শহরেও দুর্গামণ্ডপে বিজয়ার সিঁদুরদানের ভিড় সেটা প্রমাণ করে। গ্রামের তো কথাই নেই।

পিতৃতন্ত্রের থেকে ধূর্ত এবং কৌশলী আর কিছু আছে!

বিবাহের চিহ্ন হিসেবে শাঁখা-সিঁদুরকে স্বীকার করে নিয়েছিল রেণু দাস নামে একটি মেয়ে গৌহাটির আদালতে। স্বামী ডিভোর্স চাইলেও সে দিতে নারাজ ছিল। কিন্তু লোয়ার কোর্টে বলেছিল, স্বামীকে স্বামী বলে মনে করি না তাই এইসব চিহ্ন ধারণ করি না। যে সম্পর্কের বাহ্যিক প্রকাশকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, আন্তরিক কোনো সম্পর্কও নেই দুজনের মধ্যে, তাহলে মিছিমিছি কেন সে ডিভোর্স দেবে না তা আমার মাথায় ঢোকেনি অবশ্য। যেটা ঢুকেছে সেটা হল মেয়েটির এই অবস্থানকে ব্যবহার করে বিচারকদের অদ্ভুত রায়।

বিচারকেরা মনে করলেন ঠিকই, শাখা-সিঁদুর প্রত্যাখান করা মানে হিন্দুবিবাহে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মান্যতা করা। এবং এজন্য তারা ডিভোর্সের রায় দিলেন। শুধু তাই নয়, পুরুষটির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেয়েটি থাকতে চায়নি বলে তার ওপর বিচারকরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আরোপ এনেছেন। তাহলে বিয়ের পর নানা ঝামেলা একতরফা সইয়ে নিয়ে, এমনকী পণের জন্য অত্যাচারিত হতে হতেও শ্বশুরঘর করে চলা কি হিন্দুবিবাহের আর এক অভিজ্ঞান হতে চলেছে? নিত্যকার প্রবল অশান্তি অথবা পুড়ে মরার চাইতে আলাদা থাকাই কি বেশি কাম্য নয়? বিয়ের পর একতরফা মেয়েদেরই শ্বশুরবাড়ি থাকতে হবে, এই নিয়মই বা কে প্রণয়ন করল? ঘরজামাই কথাটা আমরা এত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করি কেন আজও?

সোশ্যাল মিডিয়াতেও শাঁখা-সিঁদুরের পক্ষেই বেশিরভাগ মেয়েরা। মহাসমারোহে ধর্মীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবির পর ছবি পোস্ট হয়। স্বামী সোহাগের চিহ্ন হিসেবে নাকের ওপর যথেষ্ট মাত্রায় সিঁদুর পড়েছে কিনা তার ওপরেও নজর রাখা হয়। শুভচিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেকে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা তোলেন। নিশ্চয়ই, যে যা ইচ্ছে তাইই করতে পারে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম যেন বিবাহকে শাঁখা-সিঁদুর সর্বস্ব না ভাবে। বনিবনা না হলেও আমৃত্যু তাকে শ্বশুরঘরেই কাটাতে হবে এইরকম অসহায়তার ঘেরাটোপে যেন বন্দি না হয়ে পড়ে। গৌহাটি উচ্চ আদালতের এই রায়ের পর যা হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই রায়কে মেনে নেওয়া মানে আচারসর্বস্বততাকে মেনে নেওয়া, পণবন্দি বধূর মৃত্যু ত্বরান্বিত করা এবং গার্হস্থ্য হিংসার পথ আরো প্রশস্ত করে দেওয়া। এক কথায় এই রায় শুধু নারীবিরোধী নয়, প্রচণ্ড রিগ্রেসিভ এবং কোনো-না-কোনোভাবে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় প্রবণতাকে উসকে দেবার রায়। যারা সুন্দর দেখাবে বলে সিঁদুর পরেন তারা পরুন, শুধু এইটুকু জেনে পরুন যে সেটি জীবনে অনেক কিছুর মতোই একটি রঙিন ছলনা। বিবাহিত জীবনের পূর্ণতা বা সার্থকতা কোথাও থেকে থাকলে তা অন্তত সিঁদুরের রঙে লুকিয়ে নেই।

আমাদের দেখে শিখুক আমেরিকা

শংকর কুশারী

কিছু দিন আগেও আগুন জ্বলছিল সমগ্র আমেরিকা জুড়ে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ বেঁধেছিল নিউইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো শহরগুলিতে। অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ডেট্রয়েট, ইন্ডিয়ানাপোলিস। ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী সেখানে গুলি চলেছে এবং অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন, শিকাগো, কানসাস সিটি, সান ফ্রান্সিসকো, হিউস্টন, মায়ামি, নিউ ইয়র্কের মতো দেশের অন্তত ৪০টি শহরে জারি করা হয়েছিল কার্ফু। সেসব উপেক্ষা করেই কিন্তু পথে নেমেছিলেন আমেরিকার মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই কোনোরকম সামাজিক দূরত্ববিধির তোয়াক্কা না করে। কিছুটা শান্ত হলেও প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আগুন কিন্তু সেখানে এখনও জ্বলছে ইতিউতি, ইতস্তত।

প্রতিবাদ করার মতো ঘটনা কি আমাদের দেশেও ঘটছে না? অবশ্যই ঘটছে। শ্রম-আইন পরিবর্তন করে শ্রমিকের দৈনিক কাজের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ আইনে বিভিন্ন শিথিলতা এনে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পরিবেশ বিষয়ে যথেচ্ছাচার করার লাইসেন্স। মজুতদারদের মজুত করার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে সুদের হার। বিদ্যুৎ বিল এনে ক্রস সাবসিডি প্রথা বিলোপের কথা বলা হচ্ছে। প্রতিবাদ কি আমরাও করছি না? আমরাও প্রতিবাদে ফেটে পড়ছি সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায়। কিন্তু ভুলেও ঘরের বাইরে একটা পা-ও ফেলছি না। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে মেনে চলছি সরকার নির্ধারিত সব স্বাস্থ্যবিধি। এর সঙ্গে মেনে চলছি হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি লব্ধ নির্দেশনামাও। সাবধানের কোনো মার রাখতে আছে?

মার্কিনীদের এমন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হবার কারণটা অবশ্যই ভয়ঙ্কর রকমের দুঃখজনক। মিনিয়াপোলিসের রাস্তায় সকলের চোখের সামনে একটি সামান্য অজুহাতে জর্জ ফ্লয়েড নামের একজন কালো মানুষের ঘাড়ের উপর হাঁটু চেপে ধরে তাঁকে প্রাণেই মেরে ফেললেন এক শ্বেতাঙ্গ অফিসার ডেরেক শভিন। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো সেই সংবাদ। এমনিতেই করোনায় বিপর্যস্ত, সংক্রমণ এবং মৃত্যুর নিরিখে তালিকার শীর্ষে থাকা আমেরিকার পথে পথে এখন চলছে পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদী জনতার জীবনমরণ সংঘর্ষ। চলছে ধরপাকড়, ধাক্কাধাক্কি, লাঠিচার্জ, ঘোড়সওয়ার পুলিশের লাথি, চলন্ত পুলিশভ্যান থেকে কাঁদানে গ্যাস, লঙ্কাগুঁড়ো এমনকী গুলিবর্ষণের ঘটনাও। গ্রেফতার প্রায় দশ হাজার।

এমন ঘটনা কি কিছু কম ঘটছে আমাদের দেশে? নয় নয় করেও সরকারি হিসেব মতেই ২৫ মার্চ থেকে মে-র ৩১ তারিখ পর্যন্ত গোটা দেশে কেবলমাত্র পথ দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হয়েছে মোট ১৯৮ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরো ১,৩৯০ জন। এই যে এই ক-দিনের মধ্যে ১৯৮ জন শ্রমিক মারা গেলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই একটাই লক্ষ্য ছিল যেমন করে হোক নিজের বাড়িতে, নিজের প্রিয়জনদের মাঝে পৌঁছোনো। লকডাউনে কোনো যানবাহন না পেয়ে বাধ্য হয়ে কর্মস্থল থেকে ৪০০/৫০০ কিলোমিটার দূরের বাসস্থানে পৌঁছোনোর জন্য হাঁটতে শুরু করেছেন। আর তা করতে গিয়েই কখনো মালগাড়ির নীচে, কখনো-বা লরির চাকায় চাপা পড়ে অথবা দিনের পর দিন অনাহারের যন্ত্রণা কিংবা অত্যধিক পরিশ্রমের ধকল সহ্য করতে না পেরে প্রাণ খোয়ালেন এই অসহায় মানুষগুলো। ৯ মে থেকে ২৭ মে-এর মধ্যে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে এখনও পর্যন্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অত্যধিক গরমে ৮০ জন মারা গিয়েছেন। শোকে মুহ্যমান হয়েছি আমরাও। জ্বলেছি ক্রোধের আগুনে। কিন্তু কখনোই পথে নেমে আসার মতো কোনো হটকারি সিদ্ধান্ত নিইনি। ঘরে থেকেই আমাদের সব অশ্রু অনলাইনে ভাগ করে নিয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। ক্রোধ উগরে দিয়েছি ফেসবুক, ট্যুইটারে। প্রতি মুহূর্তে মনে রেখেছি দেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা। এমন একটা সংকটময় সময়ে এক মুহূর্তের জন্যেও সরকারি নির্দেশ অমান্য করার মতো ভুল করিনি, করছিও না।

খোলা রাজপথে ফ্লয়েডের নিষ্ঠুর হত্যা দেখে ক্রোধে উন্মাদ

হয়ে গেছেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ। পথে নেমে এসেছেন কাতারে কাতারে। ঘরে বসে থাকতে পারেননি এমনকী বৃদ্ধরাও। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিউইয়র্কের বাফেলোতে পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছেন ৭৫ বছর বয়সের এক শেতাঙ্গ। রক্তাক্ত এই বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে। জর্জ ফ্লয়েডের শেষ উক্তি, 'আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে, খুব কষ্ট হচ্ছে' এখন গোটা দুনিয়া শুনে ফেলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমেরিকানরা এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা বিশ্বে। মার্কিনীরা মনে করেছেন ঘরে বসে প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। সমস্ত ঘৃণা, যন্ত্রণা, ক্রোধকে একত্রিত করে তাঁরা নেমে এসেছেন রাস্তায়। সমগ্র দেশ জুড়ে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন তাঁরা। নিজের কথা, নিজের জীবনের কথা ভাবেননি তাঁরা কেউ। এমন সংবাদও পাওয়া গেছে যে মার্কিনীদের মিলিত আন্দোলনের এই ঢেউয়ের অপ্রতিরোধ্য দাপটে এমনকী দেশের মহামহিমকেও বাঙ্কারে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে।

আমার দেশের ১২ বছরের কিশোরী ছত্তিশগড়ের জামলো মাকদম আচমকা লকডাউন ঘোষণার ফলে দিশেহারা হয়ে বাড়ি ফেরার জন্য টানা তিন-দিন, তিন-রাত হাঁটার পর যখন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে, তখন সেও কি কিছু বলেছিল? আমরা শুনতে পাইনি। ঠিক একইভাবে আমরা জানতে পারিনি মধ্যপ্রদেশের ৩৮ বছরের তরুণ রণবীর সিং-এর শেষ কথাগুলি। গুজরাট থেকে মধুবনী ফেরার পথে ভয়ঙ্কর তাপপ্রবাহ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে ট্রেনের মধ্যে মৃত্যু হয় ৩৫ বছর বয়সী এক পরিযায়ী শ্রমিক মহিলার। মুজাফ্ফরপুর স্টেশনে যখন তাঁর মৃতদেহটি ট্রেন থেকে নামানো হয় তখন তাঁর দু-বছরের অবোধ শিশুটি মায়ের চাদরঢাকা শরীরের কাছে গিয়ে বারবার চেষ্টা করছে ঘুম ভাঙানোর। কখনো চাদরের কোনা ধরে টান দিচ্ছে, কখনো নিজের মাথাটাই ঢুকিয়ে দিচ্ছে চাদরের ভিতর। তবু মায়ের ঘুম ভাঙছে না কেন? বুঝতে পারছে না সে! এমন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেও প্রতিবাদে রাস্তায় নামার কথা ভাবিনি আমরা। যোধপুরের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবক মুকেশ কুমার প্রজাপত-কে চারজন উর্দিধারী পুলিশ ঘিরে ধরে জর্জ ফ্লয়েডের মতোই অমানুষিকভাবে নিগ্রহ করছে, অথবা পিপিই এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য অপ্রতুল সরঞ্জামের দাবি জানানোর অপরাধে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. সুধাকর রাও-কে রাস্তায় ফেলে নৃশংসভাবে মারধোর করে মানসিক হাসপাতালে ভরতি করে দেওয়া হচ্ছে, এমন ভিডিয়ো দেখেও ভাবিনি পথে নামার কথা!

আমেরিকা বিশ্বকে শিখিয়েছে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম', কীভাবে ঘরে থেকে কাজ করতে হয়। আমরা উদ্ভাবন করলাম 'প্রতিবাদ ফ্রম হোম', কীভাবে নিরাপদে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে প্রতিবাদ জানাতে হয়। এমনধারা প্রতিবাদের সবচাইতে ভালো দিক হল প্রতিবাদীদেরও ঘরের স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে রাস্তায় নামতে হয় না, আবার যাঁদের বিরুদ্ধে রোষ, যাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁদেরকেও বাঙ্কারের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতেও হয় না। এঁরাও নিরাপদ, ওঁরাও নিরাপদ। আমাদের দেখে শিখুক আমেরিকা।

প্লেগের জীবাণুর খোঁজে

মানসপ্রতিম দাস

উনবিংশ শতক, বিশেষ করে তার শেষার্ধ নানা রোগের জীবাণু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এক সুবর্ণ সময়। ছোঁয়াচে বিভিন্ন রোগ যা মহামারী বা বিশ্বমারীর আকার নেয় সেগুলোর জীবাণু শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে শুরু করলেন গবেষকরা। অণুবীক্ষণের ব্যবহার শুরু হয়েছিল অনেক আগেই কিন্তু এই পর্বেই সূচিত হয়েছিল সেটার কার্যকরী প্রয়োগ। অবশ্য শুধু এই যন্ত্রের ব্যবহারেই যে মানুষ জেনে ফেলল রোগের প্রকৃত কারণ তা নয়, উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের ভিত্তিতেই তাঁরা পৌঁছোতে লাগল সত্যের কাছাকাছি। অনাদিকাল থেকে যে প্লেগ জর্জরিত করে এসেছে মানবজাতিকে তার জীবাণুও ধরা দিল বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে। তবে অন্যান্য রোগের মূলে পৌঁছোনোর মতোই এখানেও ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রোগের মূলে জীবাণু থাকার ব্যাপারটা গুরুত্ব পায়নি বহু শতক ধরে। জলাভূমি, জৈব আবর্জনায় ভরা সোঁদা মাটি থেকে উঠে আসা দূষিত বায়ু রোগভোগের মূলে, এই ছিল বদ্ধমূল ধারণা। এই বিষাক্ত বায়ু বা মায়াজমা শরীরে প্রবেশ করলে উপসর্গ দেখা দেয় মানুষের দেহে, এটাই প্রচার করতেন চিকিৎসকরা। ফরাসি রসায়নবিদ লুই পাস্তুর বিপ্লব আনলেন রোগসৃষ্টির ভাবনায়। মায়াজমাকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি জীবাণুকে চিহ্নিত করলেন দোষী হিসেবে। তাঁর থেকে প্রায় একুশ বছরের ছোটো, জার্মানির চিকিৎসক রবার্ট কখ এই কাজে আরো গতি আনলেন। দুজনের মধ্যে তীব্র রেষারেষি চলেছে অনেকটা সময় ধরে তবে তাতে আখেরে লাভ হয়েছে মানবসভ্যতার। তাঁদের গবেষণার ফলে অ্যানথ্রাক্স, টিউবারকুলোসিস, কলেরা প্রভৃতি মারণব্যাধির জীবাণু চেনা সম্ভব হল। প্রায় একই সময়ে অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞানী ব্যস্ত ছিলেন প্লেগ রোগের ধরন বুঝতে। বড়ো আকারের মড়ক সুযোগ এনে দেয় গভীরতর গবেষণার। তেমনি একটা সুযোগ এল ১৮৯৪ সালে। প্লেগের বিশ্বমারীর সূচনা হল চিনের ক্যান্টন ও হংকং-এ। তড়িঘড়ি অকুস্থলের দিকে রওনা হলেন রবার্ট কখের ছাত্র, জন্মসূত্রে জাপানি শিবাসাবুরো কিতাসাতো।

চিনে প্লেগের অনুসন্ধানের কথা বলার আগে কিতাসাতোর শিক্ষা এবং অবদানের কথা একটু জেনে নেওয়া যাক। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯২ অবধি কখের সঙ্গে বার্লিনে কাজ করেন তিনি। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ ফ্রিডরিশ উইলহেল্ম ইউনিভার্সিটিতে। ১৮৮৪ সালে জাপান সরকারের মেধা বৃত্তি নিয়ে সে দেশে গিয়েছিলেন কিতাসাতো। ১৮৮৭ সালে বৃত্তির মেয়াদ শেষ হলে তিনি আরো সময় ও সহায়তা চাইলেন সরকারের কাছে। তাঁর আবেদনকে সমর্থন করলেন কখের কাছে কাজ করা তাঁর অন্য এক প্রভাবশালী স্বদেশী, মোরি ওগাই। এদিকে কখও অনুভব করেছেন যে তাঁর দেশে কিতাসাতোর থাকা দরকার। তাই তিনি একটা পদোন্নতির ব্যবস্থা করে রেখে দিতে চাইলেন এই জাপানি গবেষককে। ফলে সে দেশে প্রথম বিদেশী হিসেবে রয়্যাল প্রুশিয়ান প্রফেসর নিযুক্ত হলেন কিতাসাতো। ১৮৯১ সালে কাজের জায়গা বদল করলেন তিনি, যোগ দিলেন প্রুশিয়ান ইনস্টিউট অফ ইনফেকশাস ডিজিজেসে। কখ তখন সেখানকার অধিকর্তা। পরে এই প্রতিষ্ঠান কখের নামে নামাঙ্কিত হয়। এর পরের বছরেই অবশ্য দেশে ফিরে আসেন ওই জাপানি চিকিৎসক। তবে তার আগে জীবাণু গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তিনি। বিশুদ্ধ কালচারে টিটেনাসের জীবাণু (ক্লসট্রিডিয়াম টিটেনি) বৃদ্ধি করার পথ দেখান কিতাসাতো। অন্যদিকে এমিল ফন বেরিং ও সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করে সেরাম থেরাপি উদ্ভাবন করেন। ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত মানুষ সুস্থ্য হয়ে উঠলে তার রক্তে জীবাণু প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন যে রক্তের কণিকাগুলোকে বাদ দিলে যে রক্তরস পড়ে থাকে তার মধ্যেও জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে। ফলে অন্য রোগীর দেহে সেই সেরাম ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিলে নিরাময় সহজ হয়। এখানে একটা কথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার, জীবাণু অর্থাৎ অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির পারস্পরিক সম্পর্ক তখনও অবধি পরিষ্কার হয়নি গবেষকদের কাছে। তাঁদের কাছে ব্যাপারটা ছিল রোগের বিষ আটকাতে পারে এমন কিছু একটা

উপাদানের উপস্থিতি রক্তরস বা প্লাজমার মধ্যে। আজ একে অনেকেই কনভালেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি বলে উল্লেখ করেন। তখনই দেখা গিয়েছিল যে মৃত্যুর পরিমাণকে আশি-পঁচাশি শতাংশ কমিয়ে দিতে পারত এই চিকিৎসা, কাজ করত যেন ম্যাজিকের মতো। প্রধানতঃ ডিপথেরিয়া রোগের অ্যান্টি-টক্সিন হিসেবে সেরাম ব্যবহার করেন বেরিং ও কিতাসাতো। ১৯০১ সালে প্রথমবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমিল ফন বেরিং পুরস্কৃত হন ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসায় সেরাম থেরাপি উদ্ভাবনের জন্য। কিতাসাতোর নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল পুরস্কারের জন্য কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় তিনি স্থান পেলেন না। জাপানে ফেরার পরও কখ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল কিতাসাতোর। তাঁর আমন্ত্রণে ১৯০৮ সালে কখ দু-মাসের বেশি সময় কাটিয়ে যান জাপানে।

ফিরে আসি ১৮৯৪ সালের কথায়। দক্ষিণ চিন হয়ে ব্রিটিশের দখলে থাকা হংকং-এ বিউবোনিক প্লেগ ছড়িয়ে গিয়ে, মারা পড়েছে বহু মানুষ। মে মাসের ৮ তারিখে স্কটল্যান্ডের তরুণ চিকিৎসক জেমস লোসন হংকং পৌঁছোলেন রোগের বিস্তার খতিয়ে দেখতে। রোগ চিনতে অসুবিধে হল না তাঁর। দু-দিন পরে এক হাসপাতালে কুড়ি জন মানুষের মৃত্যুর সাক্ষী হলেন তিনি। দোষ চাপালেন প্রশাসনের উপর, চিনের ক্যান্টন থেকে আসা সব নৌকোর যাত্রীদের পরীক্ষা করার দাবি জানালেন। তাঁর কড়া কথায় কাজ হল, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে রোগীর খোঁজ করতে শুরু করল প্রশাসনের লোকজন, তাদের সরিয়ে নিয়ে একটা আলাদা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হল। মৃতদেহ সৎকার এবং জীবাণুমুক্ত করার কাজেও গতি এল। এমন তৎপরতার মধ্যে আয়োমা তানেমিচিকে সঙ্গে করে টোকিও থেকে এসে পৌঁছোলেন কিতাসাতো। লোসন তখন গভর্নমেন্ট সিভিল হসপিটালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কিতাসাতোকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, কেনেডি টাউন হসপিটালে তাঁর জন্য গবেষণার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই প্লেগে মৃত এক ব্যক্তির রক্ত এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে স্ফীতিতে (bubo) জমা পুঁজ থেকে জীবাণু আলাদা করলেন কিতাসাতো। এই ব্যাসিলাস তিনি প্রবেশ করালেন ইঁদুরের দেহে, প্রত্যক্ষ করলেন ফলাফল। অন্য একজন রোগীর দেহেও অনুরূপ জীবাণু খুঁজে পেলেন তিনি। ১৪ জুন লোসন নিশ্চিত হলেন যে বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু খুঁজে পেয়েছেন কিতাসাতো, তিনি চটজলদি খবরটা পাঠিয়ে দিলেন ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল আর ল্যান্সেটের দপ্তরে।

এই সময়েই হংকং এলেন আলেকজান্ডার ইয়ারসিন। তাঁর সম্পর্কেও জেনে নেওয়া দরকার। ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের লেক জেনেভার তীরে ছোট্ট গ্রামে জন্ম ইয়ারসিনের। কুড়ি বছর বয়সে লুসানে চিকিৎসাবিদ্যার পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। এক বছর পরে চলে যান জার্মানির মারবার্গে। ১৮৮৫ সালে নিজের শিক্ষার কেন্দ্র আবার বদলালেন তিনি, গেলেন প্যারিসের এক বড়ো হাসপাতালে যেখানে মূলতঃ গরিবদের চিকিৎসা হয়। মুখচোরা ইয়ারসিন রোগীর চিকিৎসা করার থেকে জীবাণুর খুঁটিনাটি জানা বা প্যাথোলজিতে অনেক বেশি আকৃষ্ট হলেন। কাজ শুরু করলেন আন্দ্রে কর্নিলের গবেষণাগারে। জলাতঙ্কে মৃত মানুষদের দেহ কাটাছেঁড়া করার সুযোগ পেলেন তিনি। এরপর তাঁর পরিচয় হল এমন একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে যিনি লুই পাস্তুরের সঙ্গে মিলে জলাতঙ্কের টিকা তৈরি করেছেন। তিনি হলেন এমিলি রু (ফরাসি উচ্চারণে হু)। পাস্তুরের গবেষণাগারে ইয়ারসিনকে সহকারী হিসেবে নিয়োগ করলেন তিনি। সে সময় ফ্রান্সে নিয়ম ছিল যে নাগরিকত্ব না নিয়ে সে দেশে কেউ চিকিৎসার পেশায় থাকতে পারবে না। ১৮৮৮ সালে তাই ফরাসি নাগরিকত্ব নিলেন ইয়ারসিন। পরের বছর গবেষণা শেষ করে ইউনিভার্সিটি অফ প্যারিস থেকে ব্রোঞ্জ পদক পেলেন নিজের কৃতিত্বের জন্য। কিতাসাতো আর বেরিংয়ের মতোই রু আর ইয়ারসিন ডিপথেরিয়ার জীবাণু কোরিনিব্যাক্টিরিয়াম ডিপথেরিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা দেখান যে এই রোগে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় তার জন্য দায়ি এক ধরনের টক্সিন বা বিষ। আক্রান্ত মানুষের প্রস্রাবে সেই বিষকে শনাক্ত করলেন বিজ্ঞানীরা এবং সর্বপ্রথম ল্যাবরেটরিতে ধরা দিল ব্যাক্টিরিয়া নিঃসৃত টক্সিন। এটা দিয়ে টিকা তৈরির কথা মাথায় এসেছিল ফরাসি বিজ্ঞানীদ্বয়ের। পাস্তুর খুব খুশি হলেন নীরবে ইয়ারসিনের পরিশ্রম করা আর তাঁর বৈজ্ঞানিক মেধা দেখে। ১৮৮৮ সালে কখ-এর কাছে পাঠানো হল ইয়ারসিনকে দু-মাসের প্রশিক্ষণের জন্য। ফিরে এসে পর পর পাঁচটা শিক্ষাসত্রে পড়ালেন তিনি কিন্তু এ কাজে তাঁর মন ছিল না। ১৮৯০-তে পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে। তাঁর আদর্শ ছিলেন স্কটিশ অভিযাত্রী ডেভিড লিভিংস্টোন (১৮১৩-১৮৭৩)। ইয়ারসিন চাইতেন লিভিংস্টোনের মতো কীর্তিমান হতে। একটা জাহাজে চাকরি নিলেন যেটা সায়গন হয়ে ম্যানিলা যাতায়াত করবে। ভিয়েতনামের ভাষা শিখে নিলেন তিনি, জাহাজ চালনার খুঁটিনাটি, মানচিত্র বোঝার কৌশলও আয়ত্ত করলেন। এর পর ভিয়েতনাম সংলগ্ন জলপথে জাহাজ চলাচলে যুক্ত রয়ে গেলেন তিনি। হাঁটা পথে বহু দূরত্ব পেরোনো, বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে জীবনে কষ্ট ছিল অনেক বেশি। কিন্তু ইয়ারসিন তাতে ভীত ছিলেন না।

ইয়ারসিনের অভূতপূর্ব জীবনযাত্রার আরো কিছু কথা না বললেই নয়। গোটা এলাকাটা তখন ফরাসিদের দখলে।

পরবর্তীকালে টিউবারকুলোসিসের টিকার অন্যতম উদ্ভাবক অ্যালবার্ট ক্যালমেটে (১৮৬৩-১৯৩৩) সায়গন পৌঁছোলেন পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে দায়িত্ব পেয়ে। প্রতিষ্ঠানের একটা শাখা সেখানে স্থাপন করবেন তিনি। এ কাজে ইয়ারসিনের সাহায্য চাইলেন ক্যালমেটে, রাজিও করালেন তাঁকে। সরকারি সাহায্যে অভিযান চালানোর আশায় ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল হেলথ সার্ভিসে যোগ দিলেন ইয়ারসিন। এর পরে তিন মাসের যে অভিযানে অংশ নিলেন তিনি তাতে মেকং নদীর অববাহিকার মানচিত্র আঁকলেন। এইসব বিপদসঙ্কুল যাত্রায় তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। ১৮৯২ সালের অক্টোবরে প্যারিসে ফিরে তিনি আবার দেখা করলেন পাস্তুরের সঙ্গে, পরবর্তী কয়েকটা অভিযানের জন্য অনুমতি সংগ্রহ করলেন তাঁর থেকে। ১৮৯৪ সালে শেষ অভিযানের পর ক্যালমেটে তাঁকে পাঠালেন ব্রিটিশ অধিকৃত হংকং ভূখণ্ডে। লক্ষ্য অবশ্যই প্লেগ নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। ১৫ জুন পৌঁছোলেন ইয়ারসিন, সঙ্গে যন্ত্রপাতি বলতে একখানা অণুবীক্ষণ, জীবাণুমুক্ত করার অটোক্লেভ আর জীবাণু বৃদ্ধি করার জন্য কালচার মাধ্যম। আর ছিল দু-জন সহকারি যাদের জীবাণু নিয়ে নাড়াচাড়ায় কোনো প্রশিক্ষণ নেই। এর মধ্যে একজন আবার ইয়ারসিনের টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়ে গেল। কিতাসাতো এর আগেই এসে পড়েছেন জাপান সরকারের বৈজ্ঞানিক দূত হয়ে এবং লোসনের সাহায্যে বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু সনাক্ত করেছেন। সে খবর চলে গেছে বিলেতে। ইয়ারসিন কিন্তু লোসনের কাছ থেকে একইরকম সাহায্য পেলেন না। এমনিতে মুখচোরা তিনি, ইংরেজিটা বলতে পারেন না স্বচ্ছন্দে এবং সবথেকে বড়ো কথা, কিতাসাতোর মতো খ্যাতির চূড়ায় বসে নেই তিনি। প্লেগে মারা যাওয়া মানুষদের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার অনুমতি চাইলেন ইয়ারসিন, নাকচ করে দিলেন লোসন।

রোগ সামলাতে হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে এমন একটা ভবনের প্রাঙ্গণে বাঁশ আর খড়ের তৈরি ঘরে নিজের ল্যাবরেটরি বানালেন ইয়ারসিন। একজন ইতালিয় মিশনারী তাঁকে বুদ্ধি দিলেন যে হাসপাতালের মর্গে থাকা মৃতদেহ সৎকারের আগে পরীক্ষার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে যদি দায়িত্বে থাকা ইংরেজ নাবিকদের কিছু ঘুষ দেওয়া যায়। তাই করলেন ইয়ারসিন। মৃতদেহের উরু, কুঁচকি, বগল, গলায় স্ফীতি (bubo) থেকে পুঁজ সংগ্রহ করলেন তিনি আর তার থেকে স্লাইড বানালেন। অণুবীক্ষণের নীচে ফেলে দেখতে গিয়ে খুঁজে পেলেন ছোটো, মোটা এবং প্রান্তভাগে গোল একদল জীবাণু। উপযুক্ত রঞ্জক ব্যবহার করায় ধরা পড়লো এইসব ব্যাক্টিরিয়ার প্রকৃত চরিত্র, জীবাণুতত্ত্বের পরিভাষায় এরা গ্রাম-নেগেটিভ। জীবাণু আলাদা করে ইঁদুরের দেহে প্রয়োগ করে দেখলেন যে সেগুলোর শরীরে প্লেগ হচ্ছে। জুন মাসের ২৩ তারিখে তিনি দেখালেন যে হংকং শহরের রাস্তায় মরে থাকা ইঁদুরের উরু, কুঁচকি, বগল, গলা একইভাবে ফুলে রয়েছে, সেখানে সেই একই জীবাণুর উপস্থিতি। তিনি বললেন যে ইঁদুর এই রোগের বা তার জীবাণুর প্রধান বাহক। কিতাসাতো এভাবে খুঁটিয়ে দেখেননি বিষয়টা, তাঁর বর্ণনায় ফাঁক ছিল। তাছাড়া তিনি একটা বড়ো ভুল করেছিলেন, সংশ্লিষ্ট জীবাণু সামান্য নড়াচড়া করতে পারে বলে রায় দিয়েছিলেন। ইতিহাসকাররা বলেন, এর সম্ভাব্য কারণ হল কিতাসাতোর সংগৃহীত নমুনায় আর একটা জীবাণু ঢুকে পড়েছিল। প্লেগ আক্রান্ত রোগীর দেহে গৌণ সংক্রমণ বা সেপ্টিসেমিয়ার সময় স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনির আগমন ঘটত, সেই জীবাণুই অশুদ্ধ করে দিয়েছিল কিতাসাতোর কালচারকে। ইয়ারসিন তাঁর গবেষণাপত্র ছাপালেন পাস্তুর ইনস্টিটিউটের জার্নালে। শুরু হল বিতর্ক, কে প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার করেছে বিউবোনিক প্লেগের ব্যাক্টিরিয়া। এই বিতর্কের সরাসরি প্রভাব দেখা যায় ব্যাক্টিরিয়ার নামকরণে। ১৯০০ অবধি এর নাম ছিল ব্যাক্টিরিয়াম পেস্টিস, তারপরে ব্যাসিলাস পেস্টিস। ইয়ারসিন জীবাণুর নামকরণ করেছিলেন তাঁর গুরু পাস্তুরের নামে, পাস্তুরেলা পেস্টিস। ১৯২৩ থেকে সেটা চালু হল। অবশেষে ১৯৭০ সালে পাকাপাকি নাম হল ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস।

১৮৯৪ সালের গবেষণাপত্রে ইয়ারসিন যেভাবে প্লেগের বর্ণনা দেন তার সামান্য অংশ অনুবাদ করার চেষ্টা করা যেতে পারে :

'রোগের প্রকাশ হয় দ্রুত, জীবাণু প্রবেশের সাড়ে চার থেকে ছ-দিনের মধ্যে। বিছানা নিতে হয় রোগীকে। হঠাৎ করেই খুব বেশি মাত্রার জ্বর দেখা দেয়, সঙ্গে কখনো প্রলাপ। উরু, কুঁচকি, বগল, গলা, কোথাও একটা স্ফীতি (bubo) দেখা দেয় রোগ প্রকাশের প্রথম দিনেই। পঁচাত্তর শতাংশ ক্ষেত্রে এটা হয় কুঁচকিতে, দশ শতাংশ ক্ষেত্রে বগলের কাছাকাছি এবং কখনো কখনো ঘাড়ে এবং অন্যত্র। এই স্ফীতি খুব দ্রুত একটা ডিমের আকার নেয়। ৪৮ ঘণ্টা পরে বা তার আগে মৃত্যু ঘটে। যদি কোনো রোগী ৫-৬ দিনে বেঁচে যায় তাহলে লক্ষণ ভালো, স্ফীত অংশ নরম হয়ে আসে এবং অস্ত্রোপচার করে পুঁজ বের করে দেওয়া যায়। অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে স্ফীত অংশ তৈরি হয় না এবং এরকম হলে দেখা যায় যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বা চামড়ার উপর কিছু বিন্দুতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই রোগে মৃত্যুর হার খুব বেশি, হাসপাতালেই ৯৫ শতাংশ রোগী মারা যাচ্ছে।'

বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু আবিষ্কারের কয়েক মাস পরে ফ্রান্সে ফিরলে তাঁকে লিজয়ন দ্য অনারে ভূষিত করা হয়। এখানেই অবশ্য তাঁর প্লেগ সম্পর্কিত গবেষণা শেষ হয়ে গেল না। সেরাম থেরাপিকে প্লেগের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার জন্য

পাস্তুর ইনস্টিটিউটে কিছু দিন নিয়োজিত রইলেন ইয়ারসিন। ১৮৯৭ সালে বম্বেতে এসে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন তিনি। সীমিত সাফল্য পেলেন, চিকিৎসা পাওয়া রোগীদের অর্ধেক বাঁচলো, বাকিদের সুরক্ষা দেওয়া গেল না। এদিকে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে গণ্ডগোল বাঁধল তাঁর, তিনি বম্বে ছেড়ে ফিরে গেলেন ভিয়েতনামে। ১৯০২ সালে হ্যানয় শহরে চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর একটা প্রতিষ্ঠান গড়লেন তিনি। ১৯২৪ সালে তাঁকে ইন্দোচিনে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন শাখার অনারারি ইনস্পেক্টর জেনারেল করা হল। ১৯৪৩ সালে ভিয়েতনামের না ত্রাং নামে জায়গায় মারা যান তিনি। কিন্তু প্লেগ রোগের সংক্রমণ ছড়ানোর প্রকৃত বাহকদের সম্পর্কে ইয়ারসিন এমন কিছু অনুমান করেছিলেন যা নিয়ে গবেষণার দরকার ছিল। ইঁদুররা রোগের বাহক হলেও এবং প্লেগে মানুষের মতো ইঁদুরদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি হলেও মূল বাহক ছিল এক ধরনের মাছি। পাস্তুরের আর এক অনুগামী এবং ফরাসি নৌ-বাহিনীর তরুণ চিকিৎসক পল লুই সাইমন্ড হাল ধরলেন এই গবেষণার।

১৮৯৫ সালে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে তিনি পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। ১৮৯৭ সালে তাঁকে ভারতে পাঠানো হয় ইয়ারসিনের জায়গা নিতে এবং সেরাম থেরাপির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে। বম্বেতে যখন প্লেগ রোগের মড়ক দেখা দিল তখন সাইমন্ড নিজে রাস্তাঘাটের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে মরা ইঁদুর থেকে মানুষে রোগ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কিছু একটা রয়েছে। ১৮৯৮ সালে করাচিতে একটা সাধারণ পরীক্ষা করে তিনি বুঝলেন যে এই মাধ্যম হল মাছি জাতীয় পতঙ্গ (flea)। নর্দমায় ঘুরে বেড়ানো খয়েরি রঙের ইঁদুরদের দেহেই বাসা বাঁধে এগুলো। একটা পোষক মরে গেলে অন্য একটা পোষককে আশ্রয় করে পতঙ্গগুলো। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের জার্নালে নিজের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করলেন তিনি। ইউরোপের অন্যত্র তাঁর কাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হলেও ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ মেডিসিন থেকে তাঁকে বারবিয়ের পুরস্কারে ভূষিত করলো। ১৯০১ সালে তিনি সম্মানিত হলেন লিজিয়ন দ্য অনারে। এর পর ব্রাজিলে ইয়েলো ফিভার রোগের অনুসন্ধানে পাড়ি দেন তিনি।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

মার্কিন দেশে কোভিড অসাম্যের প্রতিচ্ছবি

স্বপন ভট্টাচার্য

চৌদ্দোশো শতাব্দীর বিউবোনিক প্লেগ থেকে শুরু করে আজকের কোভিড পর্যন্ত অতিমারি ও অতিমারিজনিত মৃত্যুর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অতিমারি আসলে সমাজে আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকা ফাটলগুলোকে চওড়া করে দেয় এবং সেই গহ্বর পার হতে দরিদ্রতর শ্রেণির মানুষ প্রায়ই অসমর্থ হয়। অতি সম্প্রতি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত হয়েছে সংখ্যা ও বিস্তৃতির বিচারে এখন পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সবথেকে বড়ো সমীক্ষাটির ফলাফল[১]। জাতি, বর্ণ ও ধর্মবিভিন্নতার জন্যই মডেল হিসেবে যুক্তরাজ্য আদর্শ বিবেচিত হতে পারে একাধিক কারণে। প্রথমত, এ দেশের জাতি ও বর্ণজনিত বিভিন্নতা (চিত্র-১)। সাদা, হিস্পানিক ও ল্যাটিনো, আফ্রিকান আমেরিকান, এশিয়ান, আদিবাসী ইন্ডিয়ান— এই এতরকম মানুষের মধ্যে সাদাদের যাকে বলে ওভারহোয়েল্মিং মেজরিটি।

২০১৯-এর সেন্সাস-তথ্য বলছে দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি লোক নন-হিস্পানিক সাদা, ল্যাটিনোরা সাদা-কালো মিলিয়ে ১৮ শতাংশের মতো এবং আফ্রিকান আমেরিকানরা ১৩ শতাংশের একটু বেশি।

যুক্তরাজ্যের জাতিগত মজুরি আয়ের বৈষম্যে এশিয়ান জনজাতির অবস্থান সবচেয়ে ভালো এবং তা জাতীয় গড়ের থেকে উঁচুতে (চিত্র-২)। অপর পক্ষে হিস্পানিক ও আফ্রিকান আমেরিকানদের তা জাতীয় গড়ের থেকে নীচু।

জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষার হারের তারতম্য নির্ণয়ে স্কুলশিক্ষা পূর্ণ করার হারকেই স্বাস্থ্য সচেতনতার নিরিখে যদি গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় তাহলেও চিত্রটা খুব একটা বদলায় না। এখানেও এশিয়ানদের গড় মান সাদাদের থেকে বেশি এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের থেকে অনেকটাই বেশি (চিত্র-৩)। আলাস্কান জনজাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই মান সারা দেশের মধ্যে সব চাইতে কম।

চিত্র-১: ২০১৯-এর সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী জাতি ও বর্ণভিত্তিক জনসংখ্যার আনুপাতিক হার[২]

Self-identified race	Percent of population
Non-Hispanic white	60.4%
Hispanic and Latino (of any race)	18.3%
Black or African American	13.4%
Asian	5.9%
Native Americans and Alaska Natives	1.3%
Native Hawaiians and Other Pacific Islanders	0.2%
Two or more races	2.7%

সে দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ কতটা তার একটা তুলনা করা যেতে পারে আনইন্সিয়োর্ড বা স্বাস্থ্যবিমার আয়ত্বাধীন নয় এমন মানুষের অনুপাতে (চিত্র-৪)। যদিও জন্মের সময় অর্থাৎ ০ বয়সে মূল চারটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পার্থক্য নগণ্য, ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে তা বিমার টাকা জমা না দিতে পারার কারণে এত বড়ো বৈষম্যে পরিণত হয়। বিমাচ্যুত হবার দরুন এই বিশেষ

চিত্র-২: ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী জাতি ও বর্ণভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মজুরি আয়ের বৈষম্য

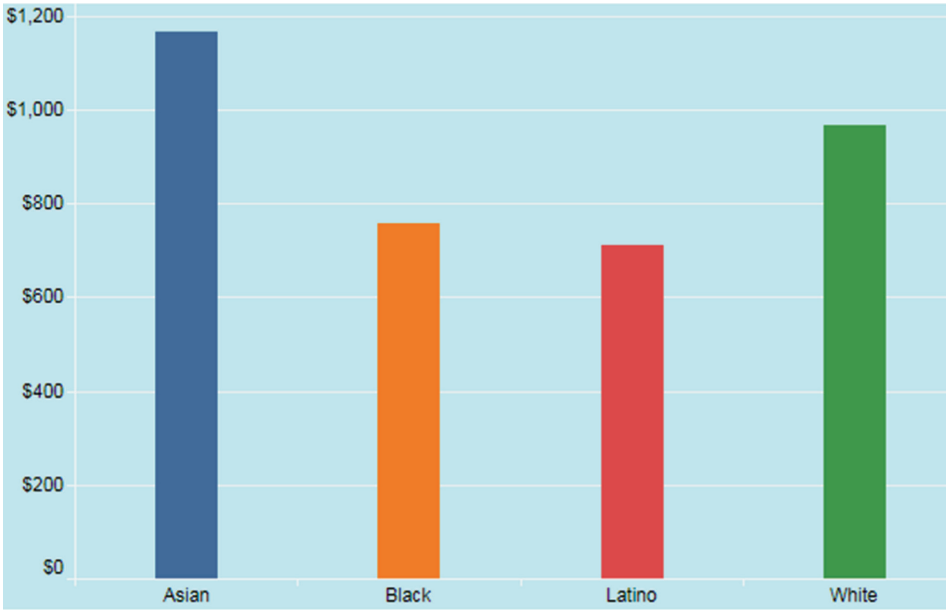

ক্ষেত্রে হিস্পানিকদের অবস্থা আফ্রিকান আমেরিকানদের তুলনায় খারাপ যদিও ষাটোর্ধ বয়সে তাদের অনেকেই পুনরায় বিমার আওতায় চলে আসেন। আফ্রিকান আমেরিকানদের অবস্থা এশিয়ানদের তুলনায় খারাপ যদিও ষাট বছর বয়সে এদের পুরনায় বিমার আওতায় চলে আসার হার এশিয়ানদের থেকেও ভালো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এই লেখচিত্র থেকে।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে কোভিড সংক্রমণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা আমাদের সবারই জানা। ৩৩ কোটি মানুষের দেশ এখন সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে শীর্ষে। আজ ৭ জুলাই যখন এই লেখা তৈরি করছি তখন সংক্রমিতের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ ছাড়িয়েছে এবং এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার লোক সেখানে মৃত। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর যে সমীক্ষার কথা শুরুতেই বলেছি তা ৫ জুলাই তারিখের অর্থাৎ তথাকথিত স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন প্রকাশিত।

আমেরিকার সবকয়টি রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ দেশবাসীর তথ্য নিয়ে এবং অন্তত ১০০০ কাউন্টির ৬,৪০,০০০

চিত্র-৩: ২০১৬-১৭-এর তথ্য অনুযায়ী জাতি ও বর্ণভিত্তিক ছাত্রদের স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ করবার আনুপাতিক হার[৪]

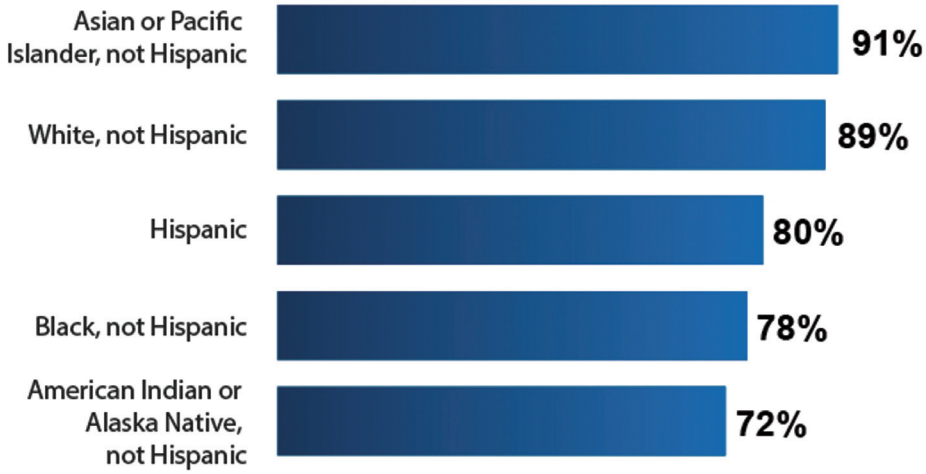

চিত্র-৪: বয়স, জাতি ও বর্ণভিত্তিক বিমাকরণের আনুপাতিক হার[৫]

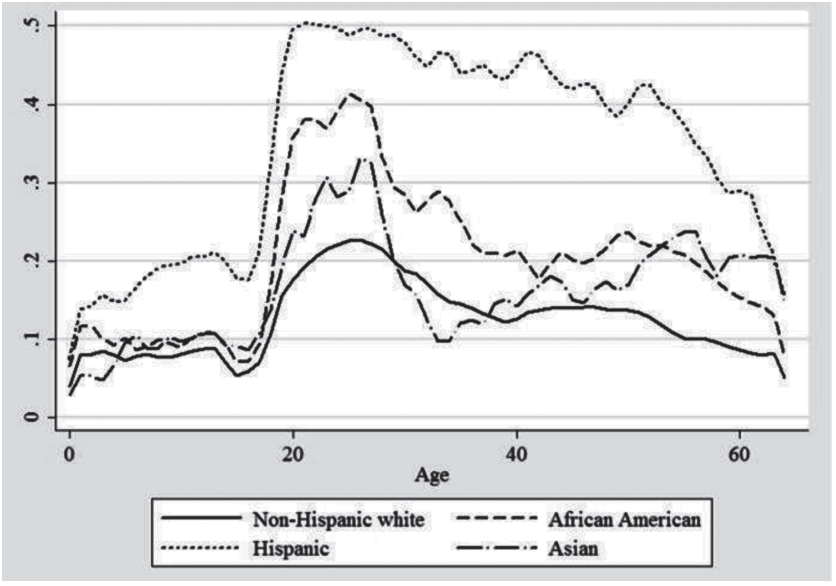

করোনা পজেটিভ মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে যে সার সত্যটি উঠে এসেছে তা হল করোনাভাইরাসের বিচরণ-সাচ্ছন্দ আফ্রিকান আমেরিকান ও হিস্পানিকদের মধ্যে একটু নয়, অনেকটাই বেশি। তাদের সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা সাদাদের তুলনায় তিনগুণ এবং মারা যাবার সম্ভাবনা দ্বিগুণ বেশি (চিত্র-৫)। এই হার আমেরিকার Centre for Disease Control and Prevention (CDC) প্রদত্ত ২৮ মে তারিখ পর্যন্ত এবং সমস্ত রাজ্যেই চিত্র মোটামুটি এক। যেমন বলা যায় ক্যানসাস সিটির কথা। সেখানকার ল্যাটিনো ও কালো মানুষদের মিলিত সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ হলেও ৪০ শতাংশের উপর সংক্রমিত তারাই। সমীক্ষকরা অন্তত ৫০০০ আফ্রিকান আমেরিকান বসবাস করেন এমন ২৪৯টি কাউন্টির মধ্যে মাত্র ১৪টি এমন কাউন্টি পেয়েছেন যেখানে তারা সাদাদের তুলনায় বেশি সংক্রমিত নয়। অন্তত ৫০০০ ল্যাটিনো মানুষ বসবাস করেন এমন ২০৬টি কাউন্টির মধ্যে ১৭৬টিতে তারাই বেশি সংক্রমিত। সমীক্ষার আওতায় আসা ৪৩ শতাংশ ল্যাটিনো ও আফ্রিকান আমেরিকান মানুষ কাজ করেন এমন পরিষেবা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে যা 'সোশ্যাল ডিসট্যানসিং' মেনে চালু রাখা সম্ভব হয়নি। তুলনায় চারজনে একজন সাদা এইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। সব কাউন্টিতেই 'ক্রাউডেড হাউসিং'

চিত্র-৫: জাতি ও বর্ণভিত্তিক সংক্রমণহারের লেখচিত্র[৬]

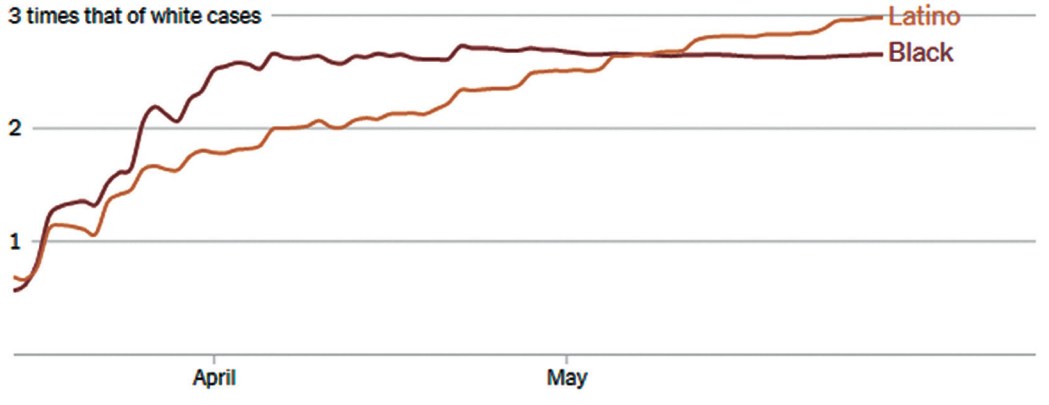

Source: Centers for Disease Control and Prevention | Note: Data is through May 28.

চিত্র-৬: জাতি ও বর্ণভিত্তিক সংক্রমণহারের বয়সকেন্দ্রিক তারতম্য[৭]

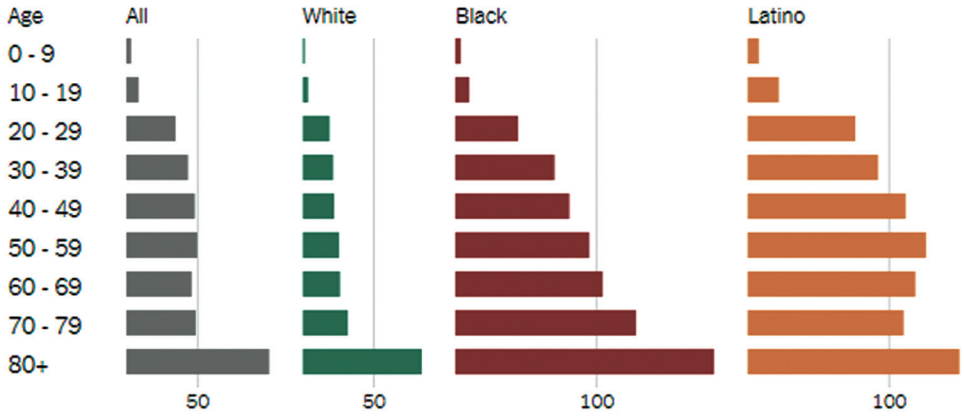

Source: Centers for Disease Control and Prevention | Note: Data is through May 28.

সাদাদের তুলনায় তাদের সংক্রমণ প্রবণতা বাড়িয়েছে। ৫০০ বর্গফুট বা তার নীচের পরিমাপের বাসস্থানে বাস করা মানুষদের মধ্যে ল্যাটিনোদের সংখ্যা সাদাদের তুলনায় দ্বিগুণ। বয়সভিত্তিক সংক্রমণ হারের (চিত্র-৬) তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে ৪০ থেকে ৫৯ বছর বয়সের ল্যাটিনোদের মধ্যে সংক্রমণ হার সাদাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। মৃত্যুতে এই বৈষম্য আরো প্রকট। মৃতদের মধ্যে ৬০ বছর বয়সীদের হার ল্যাটিনোদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ কিন্তু এই হার সাদাদের মধ্যে ৬ শতাংশেরও কম, অর্থাৎ 'ডায়েড ইয়ং' তাদের জন্য ততটা প্রযোজ্য নয়।

কোভিডে মৃত আমেরিকানদের মধ্যে যাদের বয়স আশির বেশি, তাদের মধ্যে মৃত্যুহার স্বাভাবিকভাবেই কমবয়সীদের তুলনায় বেশি এবং সাদাদের ক্ষেত্রে তা চোখে পড়বার মতো অসম। তবুও তা জাতীয় গড়কে ছাপিয়ে যেতে পারেনি কিন্তু কালো বা ল্যাটিনোদের ক্ষেত্রে এই প্রবীণ মানুষদের কোভিডে মারা যাবার হার জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ।

বলার কথা এই যে, 'ইউ ইয়র্ক টাইমস'-কে এই তথ্য পেতে হয়েছে সে দেশের তথ্যের অধিকার আইনে মামলা করে। CDC এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগে অবধি মাত্র ১৫ লক্ষ সংক্রমণের তথ্য তাদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং তাও বহুসংখ্যক রোগীর জাতি, বর্ণ, নিবাস সংক্রান্ত বিবরণ চেপে রেখে। তাদের যুক্তি, সমস্ত রাজ্যকেই তারা এই বিবরণ দিতে বলেছিল বটে কিন্তু সামাল দিতে নাজেহাল রাজ্যগুলির গভর্নরদের বাধ্য করবেন তা দিতে, এমন 'মেকানিজম' নেই তাদের হাতে। অনুমান করা যায় প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সমীক্ষার ফলাফলে আরো বড়ো ফাটল চোখে পড়বে। সমীক্ষা সেইসব পূর্বানুমানগুলিকে একেবারেই আমল দিচ্ছে না যা ট্রাম্প সমর্থকদের প্রচারে বড়োসড়ো জায়গা নিয়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল, কালো এবং ল্যাটিনোরা ডায়াবেটিসে ভোগে বেশি, তাদের হার্ট দুর্বল, তারা মোটা বেশি-ওবেসিটির শিকার এবং তারা মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করে থাকে। তাদের কম আয়, তাদের কায়িক শ্রমনির্ভর জীবিকা, তাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নির্ভরতা, তাদের বাসস্থানের অপ্রতুলতা এগুলোর মাশুল তুলছে কোভিড-একথা শিকার করতে তাদের এখনও অনীহা। যারা বাড়িতে বসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, তাদের সংক্রমণ বা মৃত্যুহার কায়িক উপস্থিতিনির্ভর এবং শ্রমনিবিড় জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনীয় হতেই পারে না। ঠিক একইভাবে কো-মর্বিডিটির তত্ত্বও অত্যন্ত একপেশে লাগে যখন বয়সের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের আক্রান্ত হবার হার তুলনা করা হয়। ভারতবর্ষে এমন একটি সমীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য জরুরি মনে হবে তখনই যখন আমরা সমাজের হাঁ হয়ে যাওয়া ফল্টলাইনগুলোকে ভরাট করার কথা ভাববো সেগুলো থেকে ডিভিডেন্ড নেবার কথা না ভেবে।

তথ্যসূত্র

১. https://nature.us17.list-manage.com/track/click?u=2c6057c528fdc6f7fa196d9d&id=44c8bd3fdc&e=5cb28cbcb6
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_ethnicity_in_the_United_State#Racial_and_ethnic_categories
৩. https://inequality.org/
৪. https://www.healthpeople.gov/
৫. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11113-016-9416-y
৬. সংকেত সংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য
৭. ওই

দেশ হারানো এক কবির গল্প

মননকুমার মণ্ডল

সব জীবনই এক-একটি গল্প। তবুও কোনো কোনো জীবনের গল্প আমাদের বাস্তবতার ধন্দে ফেলে দেয়। কবি মাত্রেই বেশি দেখেন— অনেক দূর পর্যন্ত দেখেন; কোনো কোনো কবির জীবন কাব্যের চেয়ে বেশি কিছু। পাঠক তখন সেই জীবনের সন্ধানে গিয়ে তাঁর কাব্যের জগৎ আবিষ্কার করে। ভেঙে ভেঙেই যদি জীবন গড়ে ওঠে তাহলে সেই জীবনে থাকে জীবন-ঘষা আগুন— ফুলকি ওঠে নিরন্তর, ছড়িয়ে যায় দেশ-দেশান্তরে। না-জীবনের উলটোদিকে সেই আগুন 'দেশ'-কেই প্রশ্ন করে— তার নাজুক লবজ্ হয়ে ওঠে তূণীর, আর সেখান থেকে একের পর এক প্রশ্নবান ধেয়ে আসতে থাকে কবন্ধ দেশের প্রতি। প্রশ্নে ঘেরা সেই চক্রব্যূহে 'দেশ' নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আহমেদ ইলিয়াস এমনই এক উর্দুভাষী কবি এই কলকাতা, ওই ঢাকা আর সেই পাকিস্তান তার 'দেশ'। অথচ জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কোনোটিই তার আপন দেশ হতে পারল না। কাগজপত্রে নাগরিক হলেন মাত্র, তাও নাগরিকত্বের সেই ছিদ্রপথ ঠেলে উঠে এল নতুন পরিচয়— 'বাংলাদেশী বিহারী মুসলমান'।

আহমেদ ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায় ১৯৩৫ সালের ১৭ আগস্ট। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিহারের মুঙ্গের প্রদেশের লোক। ঠাকুরদা হাজি শেখ রহমান আলি মুঙ্গের থেকে কলকাতায় আসেন এবং এখানেই স্থায়ী হন। আহমেদ ইলিয়াসের পিতা আব্দুর রহিম দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী হাদেজা বেগমের মৃত্যুর পর পিতা আব্দুর রহিম তৃতীয়বারের জন্য যাকে বিবাহ করেন সেই তৃতীয়া-স্ত্রী নূরজাহান বেগমও ছিলেন বিহারি। শৈশবে এক নিঃসন্তান বাঙালি পড়শী হালিমা খাতুনের আদর যত্নে বড়ো হতে থাকেন আহমেদ ইলিয়াস। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পর বালক আহমেদ ইলিয়াস কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়াতে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভরতি হন। সেটা ছিল ১৯৪৮ সাল। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তিনি ১৯৫৩ সালে প্রথমবার ঢাকায় চলে যান। ঢাকায় কয়েকদিনের জন্য জনসন রোডের একটি দোকানে নৈশপ্রহরীর কাজ করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন অসুবিধার কারণে আবার কলকাতায় ফিরে এসে তাকে ইসলামিয়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণিতে ভরতি হতে হয়। টাইফয়েডের কারণে সেবার তার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। ফলত সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে পুনরায় তিনি ঢাকায় চলে যান— যদি কিছু কাজ পাওয়া যায় এই আশায়। ঢাকার ৩, মহাজনপুর লেনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছেদী মিঞার বাড়িতে তাঁর এক কাকিমা থাকতেন। সেখানে থেকেই ১৯৫৮ সালে প্রাইভেটে এসএসসি পরীক্ষা দেন তিনি এবং কৃতকার্য হন। একই বছরে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তানে' একটা চাকরি পান। এই চাকরির সুবাদে তাঁকে উপজাতি অধ্যুষিত বান্দারবনে ট্রেনিং-এ যেতে হয়েছিল। একই বছরে তিনি 'কায়েদ-এ-আজম' কলেজে ভরতিও হয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে আহমেদ ইলিয়াসের বিবাহ হয় এবং ১৯৬২ সালে প্রেস-ক্লাবের ম্যানেজারের কাজে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালে উর্দু কাগজ 'পাসবানে'-তে যোগ দেন তিনি। এসময় প্রখ্যাত উর্দু কবি ফৈয়জ আহমেদ ফৈয়জের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। করাচি থেকে প্রকাশিত 'লায়ল্-এ-নাহার'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য করা হয় তাকে ১৯৭০ সালে। সেই বছরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজ তাঁকে হারাতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের কিছুদিন পর তিনি কলকাতা ফিরে আসেন ছেলের অসুস্থতার জন্য। ১৯৭৩ সালে পুনরায় ঢাকায় ফিরে যান। বাংলাদেশের একটি এনজিও 'হিড্'-এর প্রোগ্রাম-হেড হিসেবে প্রায় দশ বছর কাজ করেন। বিহারি মুসলমান উদ্বাস্তুদের জন্য লিখেছেন, উদ্বাস্তু ক্যাম্প-সংগঠনগুলির মধ্যে তাদের উন্নয়নকল্পে আজীবন কাজ করেছেন।

দুই

এই জীবনকথা যতই পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা হোক না কেন তা অপূর্ণই থাকে। জীবনসায়াহ্নে এসে এক বাংলাদেশি নাগরিক তিনি—নিজেকে বলেন বিহারি বাংলাদেশি ভারতীয় অভিবাসী।

তিনটি দেশের জমি-মাটি-স্বপ্ন তাঁকে তাড়া করে ফেরে। কলকাতার ছোটোবেলা, পূর্বপুরুষদের দেশ বিহার এবং জীবন-সংগ্রামের বাংলাদেশ। তাঁর ভাষা উর্দু, কথা বলেন বাংলায়, পেশাগত কারণে যে ইংরেজি শিখেছিলেন সেই ভাষাই তাঁর আজকের লেখালিখির ভাষা। স্বাধীন ভারতবর্ষ থেকে একদা ঢাকায় গিয়েছিলেন কিছু কাজ পাবেন বলে— ভালো লাগেনি ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারের যাওয়া আর তাকে ফিরতে দেয়নি। পূর্ব-পাকিস্তানে উদ্‌বাসিত প্রায় তিন লক্ষ অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমান মানুষের মতো তিনিও পাকিস্তানে চলে যেতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে এই বিহারি মুসলমানেরা পাকিস্তান সরকারের পক্ষ নিয়েছিল— আল শামস্, আল বদর, রাজাকারের হাত শক্ত করেছিল— একথা ঠিক। কিন্তু বিহারি মুসলমানদের একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। আহমেদ ইলিয়াস এমনই একজন মানুষ। শামীম জাহান্‌ভী, নওশর নূরীর মতো আরো অনেক এমন মানুষ ছিলেন। বাংলাভাষার সঙ্কটের দিনে একজন উর্দুভাষী হয়েও তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হলে আয়ুব খানের সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। ১৯৭২ সালের বিশ্ব-উর্দু সম্মেলনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এই উর্দু কবি। কিন্তু তবুও কেন পাকিস্তানকেই মনে করেছিলেন ‘দেশ’— নিজের স্বপ্নভূমি? মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পরও বিহারি মুসলমানদের মানসিক সংকট কাটেনি। একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলিতে যে নৃশংস অত্যাচার ও প্রাণঘাতী পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন বিহারি-মুসলমানেরা তার বিবরণ দিয়ে কুতুবুদ্দিন আইজাজ একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখেছিলেন ‘ব্লাড এণ্ড টিয়ারস্’ শিরোনামে। শর্মিলা ঘোষ তাঁর ‘ডেড রেকনিং’ গ্রন্থেও অবাঙালি পশ্চিম-পাকিস্তানীদের ওপর বিশেষত উর্দুভাষী মানুষদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার ও হত্যার কথা লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য সত্ত্বেও এইসব প্রসঙ্গগুলি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অন্যভাবে বললে এই বিষয়গুলির আলোচনা এবং যথাযথ দৃষ্টিকোণ নিয়ে সমস্যাগুলিকে দেখতে না পারার ফলেই একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে বাঙালি জাতি-রাষ্ট্র উদ্ভবের অবিস্মরণীয় সাফল্যের আদর্শ ধাক্কা খেয়েছে।

আক্রান্ত হবার ভয়ে সে সময় পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকে— অপারগ যারা ছিলেন তারা বাধ্য হয়ে থেকে গিয়েছিলেন। আজও সারা বাংলাদেশে তেরোটি ভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১১৬টি ক্যাম্পে এই অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমানেরা বসবাস করছেন। ১৯৭১-এর পরবর্তী বাংলাদেশে যাদের জন্ম তারা নাগরিক বিবেচিত হয়েছেন ২০০৩ সালের এক ঐতিহাসিক সুপ্রিম কোর্টের রায়ে; পরবর্তীতে ২০০৮ সালে সেই রায়ের সূত্র ধরে সকলেই নাগরিকত্ব পেয়েছেন— ভোটাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু শূন্যতা রয়ে গেছে সেই স্বপ্নভূমির দেশে যেতে চাওয়া মানুষগুলির। সামাজিক বয়কটের ঘেরাটোপে যেমন আজও অবাঙালি উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের কাটাতে হয়— তেমনই বাংলাদেশ জুড়ে উর্দুভাষার লেখকরা নিজেদের পরিসর খুঁজে পাননি। প্রথমদিকে তাঁদের উর্দু লেখালিখি মূলত পাকিস্তানে উর্দু ভাষাচর্চার পরিসরের আশেপাশেই পড়ে থেকেছে— এখনও বাংলাদেশী উর্দু সাহিত্যের কোনো ঐতিহ্যগত পরিসর সেভাবে গড়ে ওঠেনি। নাগরিক হয়েও ‘দেশ’ হারিয়ে গেছে তাদের। ঢাকার সৈয়দপুরের হাতিখানা ক্যাম্পের এক বাসিন্দা আব্দুল কাইউম খান বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান— ‘ভারতে দাঙ্গা শুরু হলে আমরা এপারে চলে আসি। আমরা ছিলাম মুসলমান, উর্দু ছিল আমাদের ভাষা। পাকিস্তানকে নিজের দেশ মনে করে চলে আসি এইখানে। আমরা সবসময় পাকিস্তানেই যেতে চেয়েছি’। এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির সমান্তরালে আমরা যেন খুঁজে পাই কোনো এক হিন্দুর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এপারে চলে আসার কাহিনি। এই যাওয়া-আসার বাধ্যবাধকতা মেনে নেওয়া ছাড়া যে নিরুপায় মানুষগুলির কোনো গত্যন্তর ছিল না তারাই ‘দেশ’ আর ‘নাগরিকতার’ বিভ্রমে প্রজন্ম কাটিয়ে গেলেন। জীবনের প্রত্যন্তে দাঁড়িয়ে অসুস্থ প্রায় শয্যাশায়ী এই মানুষটি কেমন যেন একটা ‘দেশ’ হারা ‘ভাষা’-হারা নাগরিকের প্রতীক হয়ে ওঠেন; না হলে কীভাবে তিনি বলেন এমন কথা— ‘এরপর নিজের বাড়ির ছবি দেখে/আমার ভয় লাগে/যেমন করে আমি নিজের বাড়ি হারিয়েছি/হারিয়েছি আসমান ও জমিন/কাগজের এই টুকরোও হারিয়ে না যায়/আমি আবার যদি গৃহহীন হয়ে যাই’। (‘কাগজের বাড়ি’; মূল উর্দু থেকে অনুবাদ জাভেদ হুসেন)

তিন

বাঙালি উদ্‌বাস্তু দেশ হারিয়ে ভাষাকে আকড়ে ধরেছিল, ধর্মকেও। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাওয়া বিহারি অ-বাঙালি মুসলমানেরা (মুহাজির) এমন এক দেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে দেশ তাঁদের স্বপ্নভূমি— কিন্তু রক্তরঞ্জিত ধর্মের উদগ্র উদ্‌যাপনে সেই দেশও নিল না তাদের। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার নাগরিকত্বের প্রস্তাব যখন দেয় (প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ১৯৪৯-১৯৭২) তখন সরকারি সূত্র অনুযায়ী প্রায় ৬ লক্ষ বিহারি সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। এদের মধ্যে ৫,৩৯,৬৬৯ জন পাকিস্তানে যেতে সমর্থ হন। যদিও অভিভাসনের এই সংখ্যাতত্ত্বে ভিন্ন মত রয়েছে। এরপরেও

বিহারি মুসলমানদের পাকিস্তানে যাওয়া চলতেই থাকে। UNHCR-এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৩-১৯৯৩ সালের মধ্যে প্রায় ১,৭৮,০৬৯ জন বিহারি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৫১ সেন্সাস অনুযায়ী পূর্ব-বাংলায় বিহারি মুসলমান উদ্‌বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৬,৭১,০০০। এই সংখ্যা ১৯৬১ সালে বেড়ে হয় ৮,৫০,০০০। পার্টিশনের পরবর্তী দুই দশকে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মুসলমান উদ্‌বাস্তু পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সমস্যা হল যারা স্বাধীন বাংলাদেশ হবার পরেও নিজের পছন্দের দেশে যেতে পারলেন না বিভিন্ন ক্যাম্পে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে থেকে যেতে বাধ্য হলেন তাদের নিয়ে। যেমন শুধুমাত্র ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পেই রয়ে গেছেন প্রায় ৪০,০০০ বিহারি মুসলমান— আজও যারা দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। আহমেদ ইলিয়াস তাদের মধ্যে কাজ করেছেন, তাদের দাবি-দাওয়া আন্দোলনের সঙ্গী হয়েছেন, তাদের নিয়ে বিস্তৃত লিখেছেন। ১৯৭১-এর আগে বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে অথবা স্বেচ্ছায় দেশান্তরি মানুষগুলির পরিচয় কিন্তু 'উদ্‌বাস্তু' হিসেবে ছিল না— যেমনটা হিন্দু উদ্‌বাস্তুদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাঁদের পরিচয় ছিল 'মুহাজির' হিসেবে— এঁদের বেশিরভাগই ছিলেন উর্দুভাষী সরকারি কর্মচারী— রেলওয়ে, ডাকবিভাগ, পুলিশ, কাস্টমসের কর্মরত মানুষজন। শুধু বিহার নয় এঁরা মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকেও গিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের পর তাদের 'মুহাজির' (ধর্মীয় পবিত্র অর্থে) সত্তা সামাজিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় 'বিহারি' (হীন অর্থে) সত্তায়। ২০০৮ সালে ঢাকার উচ্চ-আদালতের রায় ঘোষণার আগে পর্যন্ত তারাই ছিল 'রাষ্ট্রহীন'— স্টেট্‌লেস মানুষ। পরিশেষে ২০১৫ সালে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়ে দেয় আরো ১,৭০,০০০ বিহারি পাকিস্তানে জায়গা পেয়েছেন— কিন্তু বাকিদের জন্য তাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। এর ফলে বাংলাদেশে থাকা বিহারি অথবা অন্যান্য অবাঙালি মুসলমান মানুষগুলি তাদের স্বপ্নভূমির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেন। এই পর্যায়ক্রমিক ও চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান তাদের বাংলাদেশের বাংলা-ভাষা কেন্দ্রিক ভাব-বিনিময় পরিসরের সঙ্গে এক ধরনের কথোপকথনের বাধ্যতা তৈরি করেছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে উপমহাদেশে বাংলা ভাষার 'আত্ম-অপর' প্রশ্নে নতুন 'রাষ্ট্র' উদ্ভূত হয়েছে সেখানেই আরেকটি ভাষা 'অপর' হয়ে পড়েছে— দেশ হারানো মানুষগুলির ভাষার কৃষ্টি-সংস্কৃতিও আক্রমণের মুখে পড়েছে। মানবপ্রেম ও সম্প্রীতির যে অবিনশ্বর কাব্য এই উর্দু ভাষায় প্রদীপ্ত হয়ে আছে তার কোনো ঐতিহ্যই সেখানে স্বীকৃতি পায়নি। যদিও পূর্ববঙ্গে উর্দু চর্চার একটি ক্ষীণ পরিসর বহু প্রাচীন কাল থেকেই সচল ছিল। আগন্তুক উর্দুভাষীরা সেই ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠতে পারল না। ইলিয়াসের কবিতার মতো 'হলুদ পাতা' হয়েই রয়ে গেল— 'এইসব ঝরা পাতা/না বৃক্ষ না শাঁখা/কেউ তার আপন নেই আর/তার নেই কোন ঘর'।

চার

একাত্তরের উদ্দীপ্ত বাঙালির সেই বিজয় দিবসের দিনে সংখ্যালঘু উর্দুভাষীদের করুণ অবস্থা হয়েছিল। সে সব দিনকাল আমাদের এক অন্য জীবনের গল্পও শোনায়। আহমেদ ইলিয়াসের জীবনের গল্প সেরকমই। ১৯৭১ সলের ১৬ ডিসেম্বর মহম্মদপুরের বাসায় বসে যখন তিনি পাকিস্তানি সরকারের পরাজয়ের খবর শুনেছিলেন— 'রাস্তায় তখন বহু মানুষ দাঁড়িয়ে অস্ফুট ভয়ার্ত স্বরে কথা বলছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে— তাদের মুখগুলি ম্লান, করুণ'। ঢাকার মীরপুর, মহম্মদপুরের এলাকাগুলিতে উর্দুভাষী মুসলমানদের বাস অপেক্ষাকৃত বেশি বলে সেদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের এসে সেখানে জড়ো হচ্ছিল। অনেকেই নেপাল-ভারত সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাছে খবর আসছিল পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ তখনও চলছে। বিহারি মানুষগুলির সে এক অদ্ভুত ভয়াবহ অবস্থা। সেদিন ঢাকার মতিঝিলে উর্দু পত্রিকা 'জারিদা'-র অফিসে নওশর নূরীর সঙ্গে ছিলেন আহমেদ ইলিয়াস; মর্ণিং নিউজের এডিটর বদরুদ্দিন সাহেব তাঁদের গাড়িতে করে মহম্মদপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে ইলিয়াস প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাস্তার দু-পাশে ছড়ানো-ছিটনো অনেক লাশ। বাড়ি পৌঁছেই দেখেছিলেন অনেকেই গৃহত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই নওশদ নূরী আসাদ এভিনিউ-এর বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে এসে উঠেছিলেন তাঁর নূরজাহান রোডের বাড়িতে। সেদিন সকলে ঠিক করেন ফতেহ্ ফারুকের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। তিনি ছিলেন দৈনিক 'পেশবান্' ও দৈনিক 'ওয়াতন্' পত্রিকার কাজের সময় আহমেদ ইলিয়াসের বন্ধু। একটি নির্মীয়মান বাড়িতে ছাদের উপরের একটি ঘর তাঁদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল সেদিন। নওশাদ নূরী ও তিনি সেদিন সাপ্তাহিক 'জরিদা'-র মতিঝিলের অফিসে রাত কাটিয়েছিলেন। নূরজাহান রোডের বাড়ি থেকে বেরনো মাত্রই স্থানীয় দুষ্কৃতিরা তাঁর বাড়ি লুঠ করে।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মনস্থির করেন পাকিস্তানে চলে যাবেন। তখন তাঁর অনেক পরিচিত বিহারি পরিবারই নেপাল সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। বাঙালি সাংবাদিক বন্ধুরা আহমেদ ইলিয়াসের জন্য টাকা তুলে দেন। প্রবীণ সাংবাদিক খন্দকার গোলাম মুস্তফার সহায়তায় তিনি স্ত্রী-পুত্র সহ নিজের পাশপোর্ট হাতে পান। সেদিন গিয়াস কামাল চৌধুরি তাঁকে ওয়াড়ির শ্বশুরবাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টে

পৌঁছে দিয়েছিলেন। ইমিগ্রেশন ডেস্কে শুনতে হয়েছিল— তাঁর পাশপোর্টটি জাল। এমন অভিজ্ঞতা সে সময় অনেক পরিবারেরই হয়েছিল। যাই হোক অনেক প্রতিকুলতার মধ্যে দিয়ে সেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোতে পেরেছিলেন। পরের দিনই ট্রেন ধরে সোজা চলে গিয়েছিলেন বিহারের বক্তিয়ারপুর এবং সেখান থেকে একটি ছোট্ট গ্রাম 'মোরা তালেব'— যেখানে তাঁর বড়ো শ্যালিকা নূরজাহান বেগম থাকতেন। পরের দিন সকালেই সেখান থেকে বাস ধরে পাটনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। ড. ইউসুফ হাসান নামের এক বন্ধুর একটি চিঠি তাঁর সঙ্গে ছিল— কিন্তু পাটনা পৌঁছে তিনি জানতে পারেন ইউসুফ হাসান তখন পাটনায় নেই। সেখানে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় যিনি তাঁকে একটি চায়ের দোকানে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনের তৎকালীন অবস্থা বিষয়ে। সেই চায়ের দোকানে বসেই তিনি রেডিও-সংবাদ সম্প্রচারে জানতে পারেন ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক জনবিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই খবর শুনেই আশান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি বাস ধরে পাটনা ফিরে আসেন এবং পরের দিন ফিরে যান ঢাকায়। অবিলম্বে যথাবিহিত পদ্ধতিতে আবেদন করেন পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবার জন্য। কিন্তু তাঁকে হতবাক করে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সেই আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যায়। ইসলামাবাদের পাকিস্তান অভিভাসন দপ্তর থেকে চিঠি মারফৎ একথা জানতে পারার পর বাংলাদেশের ঢাকাই তাঁর 'দেশ' হয়ে ওঠে। এমন এক দেশ যেখানে ঘটনাক্রমে তিনি থেকে গেছেন— ভারত থেকে দেশান্তরিত, পাকিস্তান থেকে প্রত্যাখ্যাত এবং বাংলাদেশে অনাহূত— এমন একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় 'দেশ' খুঁজে চলা বাদে কোনো পথ তখন খোলা পড়ে নেই; সেই মুহূর্তে কোনো নাগরিকত্বই তাঁর নেই— 'আমি নিজের ঘরে সেই অতিথি ইলিয়াস/সব আমন্ত্রণকারীরা যাকে ভুলে গেছে'।

পাঁচ

আহমেদ ইলিয়াস একজন সাংবাদিক, একজন পরিচয়হীন উর্দু কবি। এমন এক কবি যিনি শুধু নিজের পরিচয়ের খোঁজেই লিখে চলেন। বাংলাদেশে 'মুহাজির' হয়ে আসা বিহারি মুসলমান এবং পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যাত 'উদ্‌বাস্তু' পরিচয়ে রূপান্তরিত মানুষগুলির একটা মুখ তিনি। এইসব মানুষগুলির রিলিফ, রেপার্টিয়েশনের আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে থাকা একজন সংগঠক; যিনি উর্দুভাষার পরিচয় নিয়ে পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর লিখে চলেছেন। এনসিআরসি-র মাধ্যমে জেনেভা ক্যাম্পের সংগঠক হিসেবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে উর্দুভাষী মানুষদের যে ন্যূনতম অধিকারটুকুও আজ স্বীকৃত হয়েছে তা আইনি পথেই হয়েছে। নাগরিকত্ব লাভের আন্দোলনের সে দীর্ঘ ইতিহাস ভিন্ন চর্চার বিষয়। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এই মানুষগুলির 'দেশ' ভাবনা, পরিচিতির সমস্যা, বাস্তবের যে ভয়াবহ সংকট-ক্রান্তির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তাতেও তাঁদের লেখায় কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ অথবা বিশ্বাসঘাতকতার লেশমাত্র নেই; বরং উঠে এসেছে নিজেদের জীবনে বাধ্যত মেনে নেওয়া আবাসভূমি ও কর্মভূমির সঙ্গে আত্মীয়তার সুর। যে পাকিস্তানকে স্বপ্নভূমি বলে জেনেছিলেন সেই পাকিস্তান দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার মর্মযন্ত্রণা নিয়েই অশীতিপর আহমেদ ইলিয়াসের মতো উর্দু কবিরা পার হয়ে যাচ্ছেন এক-একটা জীবন। পরবর্তী প্রজন্ম তো নাগরিকত্বের নিরিখেই বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ করে নিয়েছে। পার্টিশনের যে ক্ষত বহন করে বিগত সত্তর বছর এই উপমহাদেশে পরিচিত সত্তার রাজনীতি সচল থেকেছে সেখানে এমন 'দেশ' হারানো মানুষগুলির সংকটকে আমরা যদি গুরুত্ব দিতাম তাহলে উপকৃত হতাম আমরাই। আগ্রাসনের ভাষাকে কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশে উর্দুভাষী মানুষের আত্ম-সংকটও কী অন্যখাতে প্রবাহিত হয়ে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির হাত শক্ত করেনি? বৃহত্তর বাংলা ভাষার বিজয়গৌরবের দীপিত পরিসরে 'অপর' ভাষার অবস্থান কেমন, কেমনভাবে তা রাষ্ট্রের সঙ্গে কথোপকথন করে? এর ভিত্তিতেই তো তার আরো ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী স্বরূপ পরিস্ফুট হতে পারত? দেশ হারানো কবির গল্পের সূত্র ধরে এইসব কথাই বাংলা ভাষার সমূহ সঙ্কটের দিনে মনে পড়ে। আমাদের ভাষিক পরিসরকে আরো উদার করতে না পারলে কি রক্ষা আছে? সমাজ-অর্থনীতির গ্রহণ-বর্জনের পথেই তো গড়ে ওঠে পরিচিতি, 'দেশ' তো এক নির্মাণ মাত্র। এমনই এক কবির গল্পের শেষে সাজানো থাকলো তাঁরই কিছু কবিতার পঙক্তি।

যখন পথ চলা শুরু করি
আমার সাথে ছিল শুধু পথ চলা
ছেড়ে এলাম ঘর যখন
আমার নাম ছিল, ছিল পরিচয়
আমার শব্দ ছিল, ছিল ভাষা
আমার অস্তিত্বের
ছিল অংশ এরা, এরা ছিল সব

এখন কোথায় এসে থেমেছি আমি
আশে-পাশে কোথাও কিছু নেই
জিভে নেই কোনো ভাষা
ঠোঁটের আড়ালে নেই কোনো শব্দ
এ কিসের খোঁজ আমার? ('খোঁজ'; অনুঃ জাভেদ হুসেন)

বন্ধুরা, তোমাদের মতো আমিও এক জীবন
নদীর পারে এখানে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি বহু দিন

এই পথ ধরে বের হয়েছে কত নতুন পথ
বধ্যভূমির পরে এখানে আরো কত বধ্যভূমি হল

এই অচেনা বসতিতে কে কার সাথে দেখা করে
তুমিও নতুন এখানে, নতুন এখানে আমি

ইলিয়াস, আমার ঘরে সুগন্ধ তো আসেনি কোন দিন
কড়া নাড়লে ভোরের বাতাস, এখানে খুললো জানলা
('গজল'; অনুঃ জাভেদ হুসেন)

'আমি তোমায় শুধালাম— বলো আমি কে?
তুমি রইলে নীরব, বললেনা কিছু
আমি সবার কাছে জানতে চাইলাম— কে আমি?
কেউ বলল না কিছু
আমি আয়নাকে বললাম— তুমি বলো আমি কে?
আয়নাও চুপ
এবার আমি নিজেকেই বললাম— কে আমি?
আমি আর কি বলবো, আমিও চুপ রইলাম' (শনাক্তি)

'থমকে দাঁড়ালাম পথের ওপর
আমার কলম হতে চুঁইয়ে পড়া আলো এবার নিভবে হয়তো
প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছি
কেউ তো ডাকবে আমায়
কখনো তো আসবে সেই দিন যখন
আমার শব্দগুলো আমার নাম ধরে ডাকবে' (শেষ পঙক্তি)

লেখাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে আহমেদ ইলিয়াসের 'দ্য ওয়ার্ল্ড আই স' এবং 'আ লং ওয়াক' গ্রন্থদুটি। তাঁর কবিতাগুলির বাংলা তর্জমা গৃহিত হয়েছে 'আহমেদ ইলিয়াসের নির্বাচিত উর্দু কবিতা' গ্রন্থ থেকে। মূল উর্দু থেকে তর্জমাগুলি করেছেন জাভেদ হুসেন।

আহমেদ ইলিয়াসের কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'আইনে রেযে' (১৯৭৯), 'হর্ফে রেযাহ' (২০১০), 'আযাবে আগহি' (২০১৩), 'মাহাযে শব' (২০১৫), যখমে শাখে হিয্র কা (২০১৪)। তাঁর আত্মকথন ধরা আছে 'দ্য ওয়ার্ল্ড আই স' (২০১৫) আর তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ যা বাংলাদেশি বিহারি মুসলমানদের পার্টিশনোত্তর বাস্তবতাকে জনসমক্ষে এনেছিল সেটি হল 'বিহারিঃ দ্য ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেন্ট ইন বাংলাদেশ' (২০০৩)

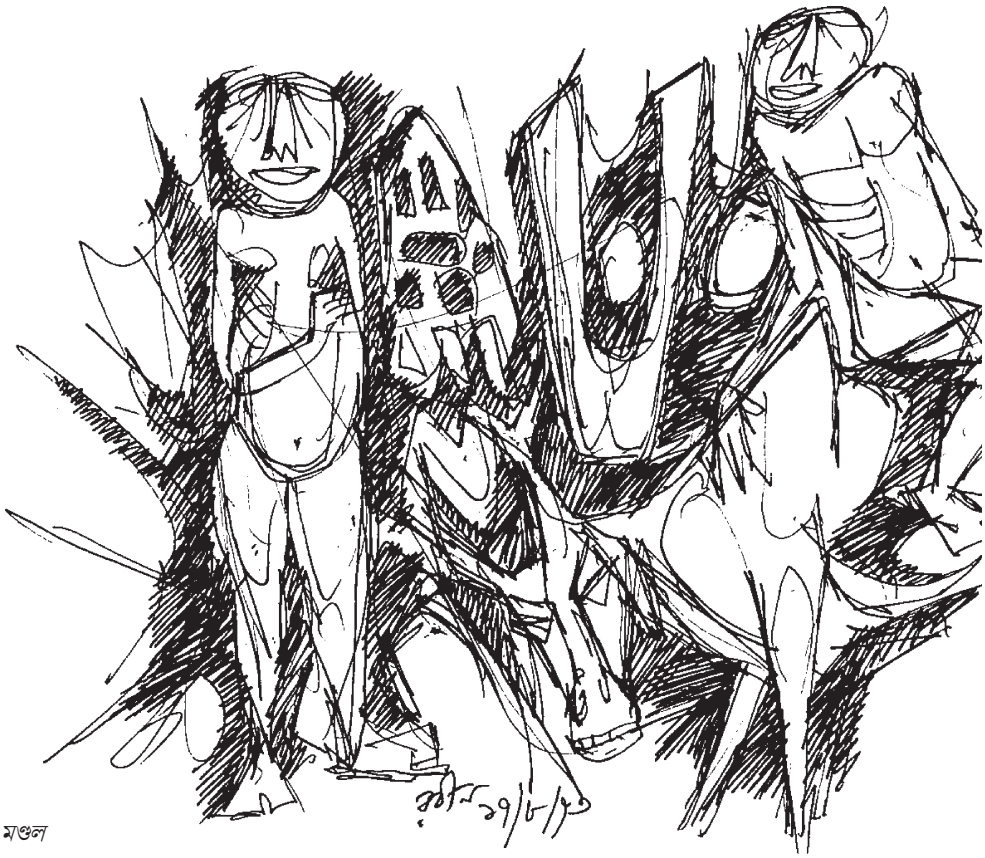

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

শেষ নাহি যে

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আত্মজীবনী *আপিলা চাপিলা*-র শেষ অধ্যায়ের সূচনায় অশোক মিত্র স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই টিপ্পনী জুড়েছিলেন এই বলে যে তাঁর আত্মজীবনীর চলন এবার থেমে যাওয়াই উচিত কেননা পাঠকের প্রত্যাশা না কি অন্য ছিল: 'যাঁরা চেয়েছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মকথন, তাঁরা হতাশ, লোকটা বাবা-মার কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, ঘরবাড়ির কথা, প্রায় কিছু জানালো না। যাঁরা একটি বিশেষ কালের বিশ্লেষণাত্মক রাজনৈতিক বৃত্তান্ত চেয়েছিলেন, তাঁরা সাহিত্যপ্রসঙ্গের নিরন্তর অনুপ্রবেশে তথা লেখকের ইতস্তত লঘুতাবিহারে বীতরাগ চেপে রাখতে পারছেন না। আর কাব্য-সাহিত্যের যাঁরা বারোমেসে ভক্ত, দেশ-সমাজ-নচ্ছার রাজনীতিকলার সাতকাহনে তারা অবসন্ন।' পাক্ষিক পত্রিকার পাতায় যাঁরা টাটকা পড়ছিলেন সে-লেখা চেনা-পরিচিত-বন্ধুজনের সে-সময়ের পাঠ-প্রতিক্রিয়ার স্মৃতি যদি খানিক জাগ্রত করার চেষ্টা করেন তবে লেখকের এমন মন্তব্য কতটা ভূয়োদর্শী ছিল তা বলাই বাহুল্য। আসলে অশোক মিত্রের ভাষায় মধ্যবিত্ত বাঙালির বৈশিষ্ট্যই হল এক বেমক্কা 'গুরুচণ্ডালী মিশ্রণ'। তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বাঙালির এই আপাত 'চরিত্রহীনতা'-কে মান্যতা দিয়েছেন। কিন্তু নিজেকে নিয়ে, আত্মসন্তুষ্টির খাঁচায় বাঁধা পড়তে চাননি। তাই *আপিলা চাপিলা*-র রাগিণী-শেষে যেন নিজেকে একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছেন, আর পাঠকের সামনে পেশ করেছেন তাঁর জীবনবোধের নির্যাস: 'জীবনে দু'টি আলাদা, পরিস্বচ্ছ, চরিতার্থতা বোধ: এক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা জন্ম; দুই, আমার চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস'। যদিও তিনি নিজের চরিতার্থ বোধ দুটিকে আলাদা বলেছেন, তবু মনে হয় ততটা বিরোধমূলকও নয় তাঁর জীবনের দুই চালিকাশক্তি।

২০১৮-র মে দিবসে তাঁর প্রয়াণের পর স্মৃতি ও উত্তরাধিকার নিয়ে লেখালেখি হয়েছে বেশ কিছু, কিন্তু অশোক মিত্রের স্মৃতি ও তাঁর কাজের বিশ্লেষণ সম্ভবত প্রথমবার দুই মলাটের মধ্যে এল প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত *অশোক মিত্র: স্মৃতি ও কথা* বইয়ে। সম্পাদক তাঁর 'নিবেদন'-এ জানিয়েছেন ২০১৮-র শারদ সংখ্যা *অনুষ্টুপ*-এর জন্য একটি ক্রোড়পত্র নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি কীভাবে এই গ্রন্থে বিস্তার লাভ করেছে। এই বইয়ের যাবতীয় লেখা ছ-টি পর্যায়ে সাজানো হয়েছে। তাতে অশোক মিত্রের জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি যেমন আছে তেমনই আছে *অনুষ্টুপ* পত্রিকায় প্রকাশিত অশোক মিত্রের সাতটি বাংলা লেখা এবং অন্যত্র প্রকাশিত দুটি বাংলা ও চারটি ইংরেজি লেখা। তবে এই পর্যায়ের অনেক ভালো লেখার মধ্যেও স্তম্ভিত করে দেয় 'আমার মৃত্যুর পর' শিরোনামে প্রকাশিত রচনাটি। এটিকে বলাই যেতে পারে লেখকের অন্তিম ইচ্ছাপত্র। এখানেও তিনি আত্মজীবনীর শেষের দিকে ব্যক্ত করা দুই চরিতার্থতা বোধের পুনরুল্লেখ করে প্রত্যয়ী ঘোষণা করেছেন: '.... কোনো জড়তা নেই, আত্মসংকটের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমি মার্কসবাদী, সেই সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথে সমাচ্ছন্ন: এই যুগ্ম গর্বভাষণেই আমার সত্তা অহংকারে উচ্ছল'। তারপর ক্রমশ ব্যক্ত করেছেন এক নিষ্পাপ বাসনা। তাঁর মৃত্যুর পর 'অবশিষ্ট' বন্ধুজনেরা যদি কোনো ছোটো স্মরণসভার আয়োজন করেন তাহলে সেখানে কোন পঁচিশটা রবীন্দ্রগান গাওয়া যেতে পারে সে-বিষয়ে আবদারের এক তালিকা নির্মাণ করেছেন তিনি। মজাটা এখানেই শেষ হয় না। পঁচিশটি গানের তালিকার পর তাঁর মনে হয়েছে বন্ধুজনেরা যদি দ্বিতীয় কোনো স্মরণসভা আয়োজন করেন সেক্ষেত্রে তাঁর আবদারের আরো পঁচিশটি গান এবং সব শেষে স্বকীয় ভঙ্গিতে তৈরি করেছেন গাড়ির পিছনে রেখে দেওয়া বাড়তি চাকার মতো আরো দশটি গানের তালিকা— যদি 'অবধারিত কারণবশত ওই পঞ্চাশটি গানের একটি-দুটি গাওয়ার মতো গায়ক কিংবা গায়িকাকে হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বন্ধুদের কাছে অনুরোধ নীচে উল্লেখিত দশটি গান থেকে বেছে নিয়ে দয়া করে শূন্যস্থান পূরণ করে নেবেন তাঁরা'। প্রসঙ্গত বলাই যায় এই পূজা-প্রকৃতি-প্রেম পর্যায়ের গানগুলি শুধু অশোক মিত্রেরই জীবনের পরম ধন নয়, বাঙালির চিরায়ত সম্পদ।

বইয়ের প্রথম বিভাগের তেরোটি রচনার বিষয় অশোক

মিত্রের স্মৃতি। এর মধ্যে প্রভাতকুমার দাসের রচনাটি ধর্মে কিঞ্চিৎ পৃথক। বাকিরা প্রত্যেকেই অশোক মিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্মৃতির কথা বললেও প্রভাতকুমার দাস পুনর্নির্মাণ করেছেন অশোক মিত্রের সঙ্গে ২০২ রাসবিহারী এভিনিউয়ের 'কবিতাভবন'-এর স্মৃতি। বুদ্ধদেব বসু অশোক মিত্রের জীবনে যে কতটা জায়গা জুড়ে ছিলেন তাও বোঝা যায় এই সংকলনে চোখ রাখলে। যে-স্মৃতি পুনর্নির্মিত হয়েছে 'কবিতাভবন ও অশোক মিত্র' রচনায়, সেই স্মৃতির সূত্র কিংবা সম্পর্কের ধরতাই চিনিয়ে দিয়েছেন অমিয় দেব এই বইয়ের সূচনা প্রবন্ধে, যা আরো বিস্তার লাভ করেছে দময়ন্তী বসু সিংয়ের লেখায়। দময়ন্তী পাঠককে প্রায় হাত ধরে ঘুরিয়ে এনেছেন বুদ্ধদেব-অশোকের সম্পর্কের অলিতে গলিতে। অব্যর্থভাবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর পিতা আর অশোক মিত্র-কে, 'অনুদ্ধারণীয় রোমান্টিক' বলে। আবার অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখার শিরোনামেই 'রোমান্টিক' শব্দটা দু-বার প্রযুক্ত হয়েছে। যদিও এই লেখাটি নিখাদ স্মৃতি নয়, শুরুতে স্মৃতির উল্লেখ থাকলেও ক্রমেই বিশ্লেষণের পথে এগিয়েছে।

অশোক মিত্র : স্মৃতি ও কথা বইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক দশটি প্রবন্ধ। তাঁর সাধনার একটা বড়ো অংশ ছিল অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে। তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ের অর্থমন্ত্রীই নন, একজন মান্য অর্থনীতিবিদ। যদিও একটা সময়ের পর বিশুদ্ধ অর্থনীতি চর্চায় তিনি সংলগ্ন থাকেননি বিশেষ। বিশুদ্ধ অর্থনীতির বইও তাঁর দুয়েকটির বেশি নয়। তবু অভিরূপ সরকার দেখিয়েছেন কীভাবে পরবর্তীকালে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বহুজনমান্য তাত্ত্বিককাঠামোর রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল অশোক মিত্রের কল্পনাতেই। অভিরূপ সরকার দ্বিধাহীন ভাবে মন্তব্য করেছেন: 'আমরা চাই মূলত তাঁকে অর্থনীতিবিদ হিসেবেই মনে রাখতে'। আর একটি রচনায় শুভনীল চৌধুরী চমৎকারভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন অশোক মিত্রের অর্থনীতি চর্চার মূল প্রবণতাগুলি। রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতি অশোক মিত্রের অনুরাগ ক্রমশ তাঁকে দূরবর্তী করেছে বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকের 'বিশুদ্ধ' অর্থনীতি চর্চা থেকে। অর্থনীতি চর্চায় শ্রেণি ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি তাঁকে পীড়িত করত। জটিল গাণিতিক জালের প্যাঁচে হারিয়ে যায় গরিব-গুর্বো মানুষের হিতসাধন, এমনটাই বিশ্বাস ছিল তাঁর। অশোক মিত্রের আরেকটি পরিচিতি, যদিও সাধারণ্যে সে পরিচিতি নির্বিকল্প প্রশস্তিময় না, শিক্ষা কমিশনের প্রধান হিসেবে (রিপোর্ট অফ দ্য এডুকেশন কমিটি, ১৯৯২)। কুমার রাণা এই এডুকেশন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিদ্যালয় স্তরে ইংরেজি শিক্ষার কথা স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে সেখানে। একই প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে সুমন ভট্টাচার্য এবং বিশ্বজিৎ রায়ের লেখাতেও। বস্তুত ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর জনপরিসরে সব থেকে আলোচিত সিদ্ধান্ত সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা। হয়তো ভূমি সংস্কার কিংবা অপারেশন বর্গার থেকেও বেশি আলোচিত। তা হবার যথেষ্ট ঔপনিবেশিক অবশেষ আমাদের স্বভাবেই ছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বিকল্প যে কিছু হতে পারে না একথা আর নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। অশোক মিত্র ১৯৮৭-তে যখন লিখলেন 'কমরেড বাচ্চা মুন্সীর ভূগোলের বই' তখন তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা আরো একবার আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছিল। জীবনের জন্য শিক্ষা, লড়াইয়ের মূলে শিক্ষা, গরিবের ছেলে-মেয়ের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করাই ছিল তাঁর ভাবনার সার। কিন্তু আমাদের রাজ্যে তাঁর ভাবনা মধ্যবিত্তের আনুকূল্য পায়নি। তবে গণতন্ত্রে জনতার মতামতের মূল্য আছে বইকি! হয়তো খুবই বৈপ্লবিক ছিল মাতৃভাষার ভিত পোক্ত করে বিদেশী ভাষা শেখানোর আয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তো কোনো বিপ্লব সাধিত হয়নি। মানুষের ভোটে, বিপুল ভোটে একটি সরকার গঠিত হয়েছিল মাত্র। এই বাস্তবতাতেই সম্ভবত সমস্যার বীজটি লুকিয়ে ছিল। যা বুঝতে ভুল করেছিল তৎকালীন সরকার। তাই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি পড়াটা মানুষের কাছে পৌঁছোল ইংরেজি তুলে দেওয়ার বার্তা নিয়ে। আরো বিপজ্জনক হল এই বার্তা শিশুমনে ঢুকে গিয়ে যে ইংরেজি তত গুরুত্বপূর্ণ হবে না আর। নব্বইয়ের দশকে বাংলার মফস্সলে এমনকী নৈষ্ঠিক বামপন্থী বাড়ির ছেলে-মেয়েদের মনেও এমন ধারণা গেঁথে গিয়েছিল 'লারনিং ইংলিশ'-এর চর্চায়। যদিও বাস্তব কেমন তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছিল উচ্চশিক্ষায় পৌঁছে। এবার এটাকে মিত্র কমিশনের দূরদর্শিতার অভাব বলা হবে, না কি সরকারি স্তরে কিংবা তথাকথিত বামমনস্ক শিক্ষকদের ঔদাসীন্য বিষয়টাকে এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় এনে ফেলেছিল তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। তবে সময়টাও সিদ্ধান্তের অনুকূল ছিল না। বিশ্বজুড়ে বামপন্থী রাজনীতির কোণঠাসা হওয়ার আর 'উদার' অর্থনীতির হাত ধরে পুঁজিবাদী অর্থে বিশ্বায়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছোতে তখন আর খুব বেশি দিন বাকি ছিল না।

আলোচ্য বইটির এই পর্যায়ে অশোক মিত্রের কবিতাভাবনাকে আশ্রয় করে অনবদ্য বয়ান নির্মাণ করেছেন শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য। আধুনিকতার দর্শনের সুলুকসন্ধান করে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে অশোক মিত্রের মন 'ধ্রুপদের অভ্যন্তরে আধুনিকের সন্ধান' করে বেড়ায়। তবে এই প্রবন্ধে যুক্তির যে ভিতের ওপর প্রকল্পটি দাঁড়িয়ে আছে তাতে কয়েকটি অসঙ্গতিও চোখ এড়ায় না। বাংলা সাহিত্যপাঠের বহুচর্চিত

দশকওয়ারি বিভাজনের ছকেই তিনি প্রাথমিকভাবে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে কবিদের চিনতে চেয়েছেন। সমস্যা সেখানে নয়। কিন্তু বিনয় মজুমদার, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, ভাস্কর চক্রবর্তীরা বাংলা কবিতায় কীভাবে 'সত্তর দশকের পর' আসেন। আর পঞ্চাশ পরবর্তী কবিদের অশোক মিত্র নজর করতেন না এমনও নয়। তারাপদ রায়ের 'দারিদ্র্যরেখা' *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তিনি এমন মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন যে কবি গ্রন্থপ্রকাশের সময় তা অশোক মিত্র-কেই উৎসর্গ করেন। আবার *অনুষ্টুপ* পত্রিকাতেই 'শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা'-য় নিজের প্রবন্ধে অশোক মিত্র লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও। কিন্তু আশঙ্কিত হচ্ছিলেন নতুন কবিতা নিয়ে। এমনও হতে পারে শাক্যজিৎ যেমন বলেছেন ধ্রুপদের প্রতি আনুগত্যই তাঁকে বিদ্রোহী তরুণের হাত ধরা থেকে বিরত করেছে। যদিও নতুন কবিতা পড়া বন্ধ হয়নি তাঁর। *অনুষ্টুপ*-এ শঙ্খ ঘোষ-কে নিয়ে লেখার শেষে তিনি কিন্তু অন্য উত্তরাধিকারের প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'যখন দেখি পরবর্তী প্রজন্মবর্তীদের মধ্যে যাঁর উপর সর্বোচ্চ ভরসা ছিল, সেই জয় গোস্বামী পর্যন্ত পরম উৎসাহে ইতিমধ্যেই নিজের কবিতার পুনর্লিখনে মেতে উঠেছেন। ভয়ে বাক্‌রহিত হতে হয় তাই। তাহলে কী, আরো একটু কনিষ্ঠ, জয়দেব বসুদেরও একই হাল হবে।' যদিও অশোক মিত্রের এমন বিশ্লেষণের সঙ্গে এই গ্রন্থ-সমালোচকের মতোই শাক্যজিৎও সম্ভবত সম্পূর্ণ একমত হবেন না। তবে মানতেই হবে নতুন কবিরাও নজরে ছিল তাঁর।

এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে *১৪০০ সাল* পত্রিকার পক্ষ থেকে ১৯৯৩-তে নেওয়া অশোক মিত্রের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। যা মানুষটিকে সত্যিই ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতে সাহায্য করে। সুচারু সম্পাদকীয় বিবেচনায় অশোক মিত্র-কে সমগ্রতায় ধরতে চাওয়ার পরিকল্পনাটি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বাঙালি পাঠকের এমন প্রত্যাশা করাও অস্বাভাবিক নয় যে অশোক মিত্রের মতো মানুষকে নিয়ে আলোচনা এই শুরু হল এবং তা চলবে এখনও অনেকদিন।

অশোক মিত্র : স্মৃতি ও কথা, সম্পাদনা প্রণব বিশ্বাস, *অনুষ্টুপ*, আগস্ট ২০১৯, ৪৫০ টাকা

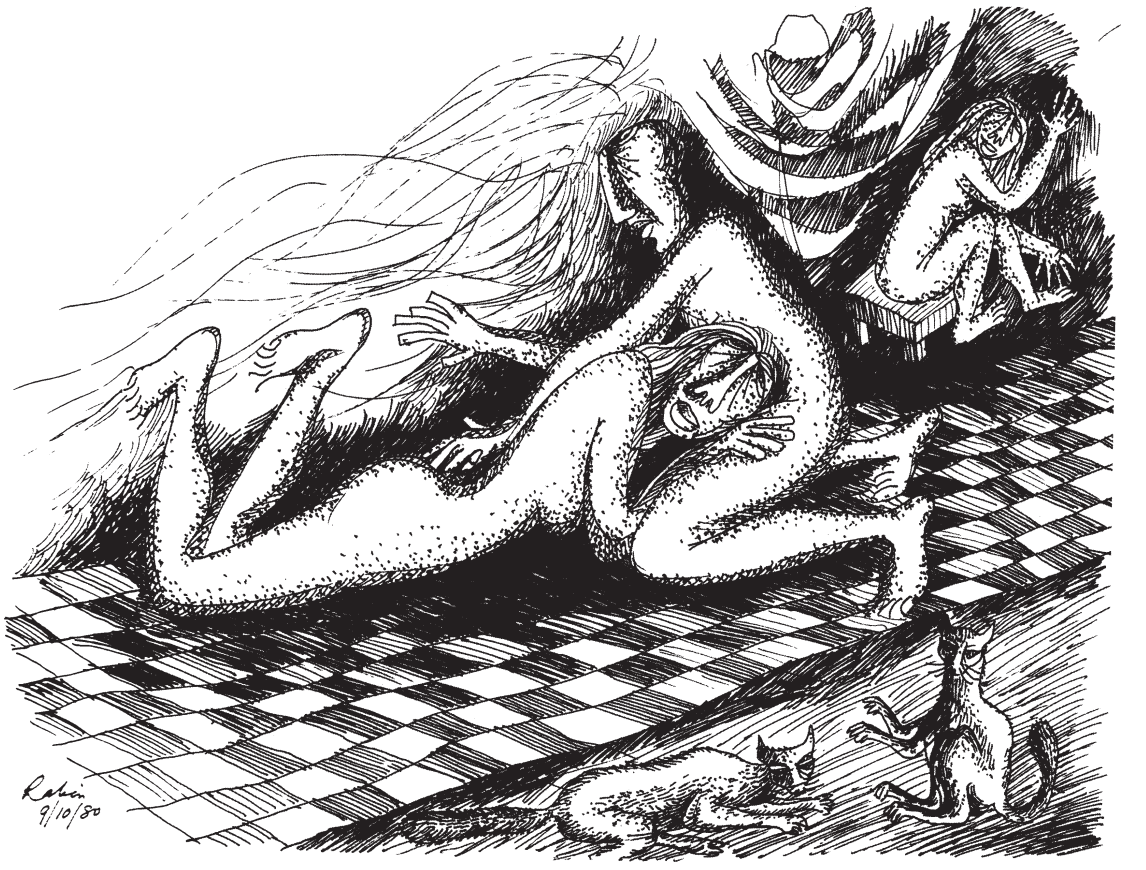

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

চিঠির বাক্সো

আরেক রকম-এর সদ্যতন সংখ্যায় (১৬-৩১ মার্চ, ২০২০) বর্গীয় জ-এর নীচে ফুটকি সংক্রান্ত আলোচনা বিস্তারিত হয়েছে দেখে খুশি হলাম। দুই বন্ধু সুভাষ ভট্টাচার্য এবং অরুণ সোম দুজনেই সংগতভাবে বুদ্ধদেব বসুকে এর ব্যাপক ব্যবহারের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আগের সংখ্যায় আমার এ বিষয়ে লেখাতে আমিও যা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি, এবং আমার বন্ধুদ্বয়েরও যা নজর এড়িয়ে গেছে তা হল, এই সুপারিশ ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতিই করেছিল। তার সুপারিশপত্রের তৃতীয় সংস্করণে (১৯৩৭) তা তালিকাবদ্ধ আছে।

এই সুপারিশ একাধিক অভিধানের পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে, এমনকী আমার রচিত 'বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা' বইটির ৬ নম্বর পরিশিষ্টতেও আছে (দে'জ ২০১৬, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)। তার ২১ সংখ্যক সুপারিশেই আছে জ স্থানে জ অথবা জ (নীচে ফুটকি) বিধেয়।

রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে এবং সুনীতিকুমার প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যতায় পরিচালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানান সংস্কার সমিতির কৃতিত্ব আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম বলে লজ্জিত। এটাও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁদের সুপারিশগুলিই পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের সমস্ত মান্য সুপারিশগুলির নীতিগত ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।

পবিত্র সরকার
কলকাতা

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Issue date 16 July 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 9 Arek Rakam

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

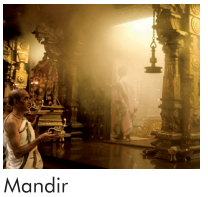
Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30